একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

প্রথম ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৪ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

15

বেদান্তবাদ।

প্রথম প্রপাঠক।

পরিচয়।

বেদান্তদর্শন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা উচিত, অতএব অদ্য আমি আপনাদের নিকটে তৎসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব।

আলোচ্য দর্শনের নাম বেদান্ত হইল কেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে অনেক সংবাদ জানা যাইবে। বেদ ও অন্ত এই দুইটি কথা লইয়া বেদান্ত শব্দ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এখানে বেদ শব্দের অর্থে কোনো মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু অন্ত শব্দের অর্থে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই বুঝায়;* এবং অন্ত শব্দের অর্থ শেষ। অতএব বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের শেষ, অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদান্তে যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ভাবে বেদের শেষ ভাগেই আছে; অতএব বেদের শেষ অংশের নাম বেদান্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলা হয়। ইহার মধ্যে মন্ত্র ভাগ প্রাচীন এবং ব্রাহ্মণ ভাগ তাহার পরবর্ত্তী; এই হিসাবে মন্ত্রকে বেদের পূর্ব্বভাগ, এবং ব্রাহ্মণকে তাহার অন্ত বা শেষ ভাগ বলিতে পারা যায়। আমরা বেদান্ত বলিতে সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ নামে যে গ্রন্থগুলি বুঝিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই এই ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকায়, এইরূপে তাহাদিগকে বেদান্ত বলিতে পারা যায়। অপর কথায় পূর্ব্বোক্তরূপে মূলত ব্রাহ্মণই বেদান্তশব্দবাচ্য, এবং ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া উপনিষদ্‌গুলিকেও বেদান্ত বলা যায়; কিন্তু ব্যবহারত সমগ্র ব্রাহ্মণকে বেদান্ত না বলিয়া উপনিষৎ-সমূহকেই বেদান্ত-নামে অভিহিত করা হয়।

আবার কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে বেদকে বিভক্ত করা যায়। বেদের এই দুই ভাগের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড আদি ও জ্ঞানকাণ্ড অন্ত। অতএব এই জ্ঞানকাণ্ডকে এইরূপে বেদান্ত বলিতে পারা যায়, এবং এই জ্ঞানকাণ্ড ও পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎ একই।

প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে নানাবিধ কর্ম্মের বিধান করিয়া শেষে আত্মতত্ত্বপ্রভৃতি জ্ঞানবিষয়ক বিবিধ কথা আলোচিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ কাণ্ডে দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মের আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষ চতুর্দ্দশ কাণ্ডটিতে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে; এই কাণ্ডটির নামই সুপ্রসিদ্ধ বৃ হ দা র ণ্য কো প নি ষ ৎ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রথম দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম ও অবশিষ্ট আট অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই শেষ আট অধ্যায়েরই নাম ছা ন্দো গ্যো প নি ষ ৎ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মবিধান করিয়া তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ ঐতরেয় আরণ্যকের পাঁচটি আরণ্যকে মহাব্রত নামক কর্ম্মের আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যকে জ্ঞান

* "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"—আপ. প. সূ. ১. ৩৩।

আলোচনা করা হইয়াছে, এই জন্য প্রথম আরণ্যক-টিকে কর্ম্মকাণ্ড এবং পরবর্ত্তী আরণ্যক দুইটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।* শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতাতেও পূর্ব্ববর্ত্তি উনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্ম্ম ও শেষ চত্বারিংশ অধ্যায়টিতে জ্ঞান আলোচিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিকে কর্ম্মকাণ্ড, এবং অন্তিম অধ্যায়টিকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।† এইরূপ অন্যত্রও প্রায়ই দেখা যাইবে যে, অগ্রে কর্ম্ম ও তাহার পর জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কাশী হইতে প্রকাশিত ১ সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহের একখানি টীকাতে বেদান্ত শব্দের দুইটি ব্যুৎপত্তি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একটি পূর্ব্বোক্ত বেদের অন্ত বেদান্ত, অপরটি বেদের অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে, তাহা বেদান্ত। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটির তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বেদের চরম শেষ সিদ্ধান্ত বেদান্ত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজিতে রহিয়াছে, এই জন্যই তাহার নাম বেদান্ত। অন্ত শব্দের অর্থ নির্ণয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ; স্থানান্তরে শঙ্কর, রামানুজ, আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য্য) প্রভৃতি আচার্য্যগণও নির্ণয় অর্থে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। ২ সিদ্ধান্ত ৩ শব্দের অন্ত শব্দও এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, অন্ত শব্দের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ শেষ, চরম এই অর্থ হইতেই ক্রমে নির্ণয়, নিশ্চয় অর্থ হইয়াছে। যাহাই হউক, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহটীকার এই দ্বিতীয় অর্থটি কল্পনাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

বেদান্ত শব্দটি কোনো প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদের মধ্যে দেখা যায় না। শ্বেতাশ্বতর ৪ ও মুণ্ডক ৫ এই দুই খানি প্রাচীন, এবং মহানারায়ণ ৬ ও কৈবল্য ১ প্রভৃতি পরবর্ত্তী উপনিষদে ঐ শব্দ আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ২ ইহা আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বেদান্ত বলিতে মূলত উপ-নিষৎ বুঝিতে হয়। ৩ উপনিষদেই বেদান্তবাদের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—যদিও ইহার বীজ ও অঙ্কুর মন্ত্রা-ত্মক সংহিতার মধ্যেই প্রকাশিত। সংহিতায় যাহা সূক্ষ্মাকারে ছিল, বেদান্ত বা উপনিষদে তাহাই বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদান্ত বলিতে যখন প্রধানত উপনিষৎকেই বুঝিতে হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা না বলিলে চলে না। এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমত আমরা ঐ উপনিষৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আরম্ভ করিব।

বেদান্তবিদ্গণ বলেন যে, উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ বিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডল মিশ্র) স্বকীয় বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিকে উ প নি ষ ৎ শব্দের ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া তিনটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপঃ—উ প-উপসর্গ ও নি-উপসর্গ-পূর্ব্বক স দ্ ধাতু হইতে (ক্বিপ্-প্রত্যয়ে) উ প নি ষ ৎ পদ হইয়াছে। উ প উপসর্গের অর্থ সামীপ্য, নি উপসর্গের অর্থ নিঃশেষ অথবা নিশ্চয়, এবং সদ্ ধাতুর অর্থ বিশরণ (অর্থাৎ হিংসা,) গতি, ও অবসাদন (অবসন্ন-করা।) সুরেশ্বরাচার্য্য সদ্ ধাতুর এই ত্রিবিধ অর্থ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—(১) ব্রহ্ম-বিদ্যা যেহেতু এই জীবকে অদ্বৈত ব্রহ্মের সমীপে লইয়া গিয়া ইহার অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত কার্য্যকে নিঃশেষ রূপে নাশ করে, সেই জন্য তাহার নাম উপনিষৎ। (২) অথবা যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা জীবের অনর্থমূল অবিদ্যাকে নিঃশেষ রূপে বিনাশ করিয়া অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জীবরূপে গ্রহণ করায় বুঝাইয়া দেয় (গ ম য় তি,)—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিহত হইলে জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই জন্য তাহার নাম উপনিষৎ। (৩) অথবা যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যাকে উচ্ছন্ন করায়, প্রবৃত্তির কারণ-স্বরূপ তন্মূলক রাগ দ্বেষ প্রভৃতিকে অ ব সা দি ত করে, সেই জন্য তাহার নাম উ প নি ষ ৎ।"

কঠোপনিষদ্-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"যে

* "কর্ম্মকাণ্ডং সমাপর্য্য বেদো জ্ঞানং বিবক্ষতি॥
আরণ্যকং দ্বিতীয়ং যৎ তৃতীয়ঞ্চ তদাত্মকম্।
জ্ঞানকাণ্ডং ততঃ সোপনিষদিত্যভিধীয়তে॥"

ঐ. আ. ২. ১. ১।

† "একোনচত্বারিংশতাধ্যায়ৈঃ কর্ম্মকাণ্ডং নিরূপিতং। ইদানীং কর্ম্মাচরণশুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানকাণ্ড-মেকেনাধ্যায়েন নিরূপ্যতে।"

বাজসনেয়ি সংহিতা ভাষ্য মহীধর।

১ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত পুঁথী।
২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২. ১৬।
৩ এই অর্থেই প্রযুক্ত কৃতান্ত শব্দও উল্লেখ্য।
৪। ৬. ২২।
৫। ৩. ২. ৬।
৬। ১০. ৬; ১০. ৮।

১। ৩, ২২।
২। ১৫. ১৫।
৩। বেদান্তসারে সদানন্দ যতি ইহাই বলিয়াছেন—"বেদান্তো নাম উ প নি ষ ৎ-প্রমাণম্।"

সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিক বিষয় সমূহে বীতরাগ হইয়া (ব্রহ্ম) বিদ্যার নিকটে উপস্থিত হন ও তন্নিষ্ঠ হইয়া নিশ্চয়ের সহিত তাহাকে ভাবনা করেন, (ব্রহ্মবিদ্যা) তাঁহাদের সংসার বীজস্বরূপ অবিদ্যাকে বিশরণ অর্থাৎ হিংসা বা বিনাশ করে, এই জন্য সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ বলা হয়। তিনি স্থানান্তরে আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সমীপে লইয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়াও বিদ্যাকে উ প নি ষ দ্ বলা যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার নাম উ প নি ষ ৎ হওয়ায়, যে সকল গ্রন্থে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা বা উ প নি ষ ৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ সমূহকেও অভেদ ব্যবহারে গৌণভাবে উ প নি ষ ৎ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য কোনো কোনো স্থানে উপনিষৎ শব্দ সাধারণ বিদ্যা বা দ র্শ ন (তত্ত্ব) অর্থে ধরিয়াছেন। * এক স্থানে † তিনি যোগ অর্থেও ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উ প নি ষ ৎ পদে যখন তিনি সেই নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তখন এই দুইটি অর্থের কোনোটিই উল্লেখ করেন নাই, তখন তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মবিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন উপনিষৎ শব্দের আরো একটি অর্থ রহস্য। এই অর্থ সাধারণপ্রচলিত কোষেও আছে, ‡ এবং শঙ্করাচার্য্যও উপনিষদ্ ভাষ্যে স্থানে স্থানে এই অর্থ ধরিয়াছেন। ‖ ব্রহ্মবিদ্যা যে অতিরহস্য অতিগুহ্য, ইহা যে সকলের নিকট প্রকাশ পায় না, ইহা যে, অতিগভীর অতিনিগূঢ় তাহা প্রসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে র হ স্য বি দ্যা বলিতে পারা যায়, এবং তজ্জন্যই ইহাকে রহস্য বাচক উ প নি ষ ৎ শব্দে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উ প নি ষ ৎ কে স্পষ্টতই বে দ গু হ্য অর্থাৎ বে দে র র হ স্য বলা হইয়াছে। ¶

* বৃহ. আ. ৪. ২. ১, ছান্দোগ্য ৮. ৮. ৪, ৫; তৈ. উ. ১. ৩. ১; ছান্দোগ্য ১. ১৩. ৪।

† ছান্দোগ্য. ১. ১. ১০।

‡ "ধর্ম্মে রহস্যুপনিষৎ"—অমর।

‖ "ব্রহ্মোপনিষদং বেদ"—এই ছান্দোগ্যোপনিষদের (৩. ১১. ৩) ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "ব্রহ্মোপনিষদং বেদ গুহ্যং বেদ।" দ্রষ্টব্যঃ—তৈ. উ. ১. ৩. ১; ১১. ৪; ২.৯. ১; বৃহ. আ. ৫. ৫. ৪।

¶ "তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্"—শ্বেতা. উ. ৫. ৬। "বেদেষু গুহ্যা বা উপনিষদ :—"ইতি নারায়ণ কৃত দীপিকা।

ব্রহ্মবিদ্যাকে রহস্য বলিবার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা অতিগম্ভীর, অতিদুর্জ্ঞেয়; প্রকাশ করিলেও সাধারণ লোকে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; সাধারণ ব্যক্তি অনেক সময় এই তত্ত্ব শুনিয়া তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে। তাঁহার পা নাই, অথচ তিনি দ্রুত গমন করেন; তাঁহার হাত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন;" "তিনি অচল হইলেও মন অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী;" ১ "তিনি চল, তিনি অচল; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সমস্তের অভ্যন্তরে, এবং তিনি ইহার বহির্ভাগে;" ২ এই সকল কথার তাৎপর্য্য সাধারণ ব্যক্তিরা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাহারা এই সমুদয় কথাকে অসম্ভব বলিয়া একবারে উড়াইয়া দিতে পারে, এবং এইরূপে প্রকৃততত্ত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহারা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থূলদর্শী অসংস্কৃত-চিত্ত সাধারণ লোকের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন, এবং সেই জন্যই ঐ তত্ত্ব বা বিদ্যাকে গুহ্য বা র হ স্য বলা হইয়াছে। উপনিষৎ সমূহে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, সহজে কেহ ঐ বিদ্যা লাভ করিতে পারেন নাই, আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যার উপদেশ লাভ করা যাইত না। আচার্য্য শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আবশ্যকমত অল্প বা দীর্ঘকালযাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠান করাইয়া এবং তাহাতেই শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে সংস্কৃত করিয়া গভীর তত্ত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তাহার পর সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিতেন এবং শিষ্যও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন। যত দিন শিষ্য উপযুক্ত না হইতেন ততদিন আচার্য্য সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহার নিকটে প্রচ্ছন্ন করিতেন, কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না। উপনিষদে ইহার দৃষ্টান্ত শত শত রহিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপ রহস্য বলিয়াই অনেক সময়ে তাহা অ র ণ্যে র মধ্যে আলোচিত হইত, এবং তাহা হইতেই কতকগুলি বৈদিক গ্রন্থের নাম আ র ণ্য ক হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অন্যান্যও যে সকল কর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্ব রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তৎসমুদয়ও অ র ণ্যে আলোচিত হইত, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থগুলিকেও তজ্জন্য আ র ণ্য ক নামে অভিহিত

১ শ্বেতাশ্ব. ৩. ১৯।

২ ঈশা. ৪।

করা হইয়া থাকে, * এবং রহস্য শব্দে তাহাদেরও উল্লেখ দেখা যায়।†

আরণ্যক নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই ‡ ব্রাহ্মণের মধ্যে। ব্রাহ্মণের ঐ বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অরণ্য মধ্যে আলোচিত হইত বলিয়া সেই অংশগুলিকে সাধারণ আরণ্যক নামেই উল্লেখ করা যায়, তাহার সহিত ব্রাহ্মণ শব্দ আর ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এই সকল আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই এক দেশ। শতপথ ব্রাহ্মণেরই চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষৎ বলা হয়, কেননা, ঐ ব্রাহ্মণের ঐ অংশ অরণ্যেই পঠিত হইত বলিয়া তাহা আরণ্যক, পরিমাণে বৃহৎ বলিয়া তাহা বৃহৎ, ¶ এবং রহস্য বলিয়া তাহা উপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট স্বরূপ, ‖ এবং ইহারই শেষ সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠকের নামই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ঐতরেয়-আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত, এবং এই ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদকেই (আরণ্যক) ঐতরেয় উপনিষৎ বলা হইয়া থাকে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

রহস্য গ্রন্থসমূহের অরণ্যে অধ্যয়ন করিবার বিধি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্পষ্টই দেখা যায়। ঐতরেয় আরণ্যকের সর্ব্বশেষ খণ্ডেও ।(৫. ৩. ৩) তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

সদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন সংসদ্ শব্দ, ওপরিষদ্ শব্দ যেমন সভা বুঝায়, উপনিষৎ শব্দও সেইরূপ ঐ ধাতু হইতেই উৎপন্ন, এবং ইহাও তাহাদের ন্যায় সভাকেই বুঝায়, তবে ইহা সাধারণ সভা নহে, ইহা রহস্য সভা; মহর্ষিগণ এইরূপ রহস্য সভাতেই ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিতেন, এবং তাহা হইতেই ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা ও তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাবলীর নাম উপনিষৎ হইয়াছে। কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Dr. Paul Deussen) এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। আমার নিকটে এ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না। উপনিষৎ শব্দ কোনো স্থলে সভা বুঝাইতেছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সংসৎ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে দিবিষদ্ শব্দেরও অর্থ কোনোরূপ সভা ধরিতে হয়। যিনি বলিতে চাহেন যে, উপনিষৎ শব্দ প্রথমে রহস্য সভা, তাহার পর রহস্য বিদ্যা -ব্রহ্মবিদ্যা, এবং তদনন্তর রহস্য গ্রন্থকে (উপনিষৎকে) বুঝাইয়াছে, তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখইতে হইবে; কেবল প্রতিজ্ঞায় বস্তুসিদ্ধি হয় না। ইনি এক সোপান নীচে নামিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত স্থানেই উঠিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতীয় ব্যাখ্যাকারগণ উপনিষৎ শব্দে যে রহস্য বিদ্যা অর্থ করিয়াছেন ইনিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই অর্থের জন্য তাঁহাকে আর একটি অধিক অর্থ (সভা) স্বীকার করিতে হইয়াছে॥

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* "অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে। অরণ্যে তদধীয়াত্যেবং বাণ্যং প্রবক্ষ্যতে॥"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক-সায়ণভাষ্য, উপক্রমণিকা।

† "এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ......"—গোপাল ব্রাহ্মণ, ১. ২. ৯; এখানে রহস্য শব্দে আরণ্যকই বুঝিতে হইবে—শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী, ত্রয়ীপরিচয়, ৫৮।

‡ অধিকাংশই এই জন্য বলিতেছি যে, সামবেদের মন্ত্র ভাগেরই মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র আরণ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

¶ "সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যকম্, বৃহত্ত্বাদ্ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শাঙ্করভাষ্য উপক্রমণিকা।

‖ "ব্যাখ্যাতা...মন্ত্রা ব্রাহ্মণ ভাগাশ্চ, ইদানীংতচ্ছেষভূতম্ আরণ্যেঽনুবাক্যং তন্ত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—তৈ. আ. ভট্টভাস্কর ভাষ্য-উপক্রমণিকা।

বিজয়ী।

আজিকে হৃদয় পুনঃ এসেছে ফিরিয়া বক্ষে মম
সগৌরবে, বিশ্বজয়ী অশ্বমেধ তুরঙ্গমসম
জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া। আজ সাধ্য নাই আর
বাঁধিয়া রাখিতে তারে সঙ্কীর্ণ এ অঙ্গনে আমার
কোনমতে; যে পেয়েছে আত্মবিজয়ের মহানন্দ
অমৃতের আস্বাদন, নির্ম্মুক্ত সে, কোনো বাধাবন্ধ
নাহি রহে কোথাও তাহার; সে যে পবনের মত
বিশ্ববন্ধু, সিন্ধুর মতন দৃপ্ত উদ্যোগী নিয়ত,
নির্ম্মল আলোকপ্রায় প্রসারিত গগনে ভুবনে,
অসীম আকাশসম পরিব্যাপ্ত অনন্ত জীবনে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নববর্ষ।

আজ আমরা পুরাতন বর্ষ অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিয়াছি।

আজ আমাদের হিসাব লইবার দিন। দেখিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ আদর্শকে আমরা আশ্রয় করিয়াছি

তাহাকে আমাদের জীবনে কতদূর সফল করিতে পারিয়াছি।

এই জন্য প্রথমেই আমাদিগকে সুস্পষ্ট করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কি আদর্শ? এই ধর্ম্মের দুই দিক আছে, এক আধ্যাত্মিক এক সামাজিক। প্রথম, আধ্যাত্মিক সাধন, অর্থাৎ যে সমস্ত সাধনে আত্মশক্তি উপার্জ্জন করা যায়। সেই সাধনার আরম্ভেই আমাদের সংযম চাই কেন না প্রবৃত্তি বলবতী। কামনা দুষ্পূর—কিছুতেই তার আশা মেটেনা। 'অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ' কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা আরো জ্বলিয়া ওঠে।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

এই হেতু সংযমদ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে বশে আনিতে হইবে, নতুবা আমাদের সমূহ দুর্গতি। ব্রত অনুষ্ঠান ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাস—নানা সাধনা তপস্যা, ইহার উদ্দেশ্যই প্রবৃত্তি সংযম।

এই ত গেল একদিক কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আর এক দিক আছে, সে সামাজিক। তাঁর আদেশ পালন শুধু আপনার জন্য নয়। সমাজের হিতের জন্য তোমাকে জাগ্রত থাকিতে হইবে—সাধনা করিতে হইবে।

দেখ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কি বিস্তীর্ণ! আমাদের সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, কত প্রকার অভাব রহিয়াছে দূর করিতে হইবে, কত কুসংস্কার আছে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কত দুঃখ দারিদ্র্য রহিয়াছে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে হইবে—ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

এই জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান একতা। আমাদের মধ্যে সেই জাতীয় মঙ্গলের মূল পদার্থটিরই একান্ত অভাব। জাতিভেদে আমরা আপনাদের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন—হিন্দু হিন্দুতে দলাদলি, হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য, আমাদের জাতীয় জীবন গঠন হইবে কোথা হইতে। জাতীয় মঙ্গলের দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। সেই মহৎ কার্য্যের ভার লইতে আজও আমরা কেহ যথার্থ ভাবে প্রস্তুত হই নাই।

এমন কত বলিব! বস্তুত সামাজিক মঙ্গল-সাধনব্রত আমরা যথার্থভাবে গ্রহণ করি নাই বলিলেই হয়। সমাজের মধ্যে আমাদের উন্নতির বাধাজনক কত সহস্র আবর্জ্জনা জমিয়াছে সর্ব্বত্রই আমাদের মনুষ্যত্ব কেবল বাধাই পাইতেছে। বর্ণাশ্রম এক বাধা, লোকাচার এক বাধা, শাস্ত্রের অন্ধ অনুশাসন এক বাধা। এ সমস্তকে ভাঙিয়া ফেলিয়া আমাদের চিত্তকে আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই আজ সচেষ্ট হইয়া উঠিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের যাহার যাহা সামর্থ্য—সেই পরিমাণে এই মহৎ মঙ্গলকার্য্যে আমাদের প্রত্যেককে মিলিতেই হইবে! প্রতি জনে কিছু না কিছু জোর দিয়ে টানিলেই সমাজরথ উন্নতির পথে সহজে ধাবিত হইবে। আমি যতটা পারি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট—সাধু যার চেষ্টা ঈশ্বর তার সহায়! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। চেষ্টা বর্ত্তমানে বিফল হয় হইলই বা, বিফলতার মধ্য দিয়াই সাফল্য একদিন অভাবনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি
যিনি কল্যাণকারী তাঁহার কখনই দুর্গতি হয় না। যে উদারহৃদয় মহাত্মা বঙ্গে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এই বিদ্যালয়ে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—যাঁহারা অনাথ বালক বালিকা বিধবাদের জন্য আশ্রমালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—যে সকল সাধুপুরুষ অন্ধ ও মূকদের শিক্ষাদানে কায়মনে যত্নশীল, যে বীরাঙ্গণা বিধবাদের ভরণপোষণ শিক্ষা উপযোগী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন—তাঁরা ধন্য—তাঁদের সৎকার্য্য জয়যুক্ত হউক—ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

মহাপুরুষ ঈশাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অনুশাসন কি, তিনি উত্তর করিলেন, পরম পিতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিবে আর তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত ভালবাসিবে—ধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ নিয়ম। ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা—ধর্ম্মের এই দুই প্রধান অনুশাসন। প্রেম ও সেবা এই দুই উপকরণে মিলিয়া ব্রহ্মপূজা সম্পূর্ণ হইবে।

এই ব্রহ্মপূজায় আত্মশক্তি ও দেবভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। এই জন্য একদিকে সর্ব্বতোভাবে শক্তির সাধনা, আর একদিকে সেই শক্তির মূলে যিনি আছেন প্রীতিযোগে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, এ দুইই আবশ্যক। এক দিকে বাহিরে কর্ম্মের দ্বারা শক্তির ক্ষেত্রে আর একদিকে অন্তরে ভক্তির দ্বারা আনন্দের ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ যোগসাধন করিতে হইবে।

অদ্যকার নববর্ষের শুভদিনে এই মহাব্রত এই ব্রহ্মপূজা যেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারি,

যিনি আমাদের চির দিনের পরমমঙ্গল তিনি আমাদিগকে সেই মঙ্গলবুদ্ধি প্রেরণ করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেমের লক্ষণ কি, কি ?

প্রেমের প্রথম লক্ষণ সহবাসের ইচ্ছা। যিনি যাঁহাকে ভাল বাসেন, তিনি তাঁহার সহবাসের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া সুখী হন।

কিন্তু যিনি পরমেশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের সহবাস কেমন করিয়া লাভ করিবেন ? মানুষ কীটানুকীট হইয়া সেই মহান্ অনন্তের সহবাস কেমন করিয়া লাভ করিবে ? পরিমিত মানবের পক্ষে কি অনন্তের সহবাস সম্ভব ?

তিনি অনন্ত বলিয়াই তাঁহার সহবাস সম্ভব। অনন্ত কাহাকে বলে ? সকলই যাঁহার মধ্যে। সকলই সেই অনন্ত পুরুষের অন্তর্গত। যদি সকলই তাঁহার অন্তর্গত না হয়, যদি তাঁহার বাহিরে কিছু থাকে, তাহা হইলে, তিনি কেমন করিয়া অনন্ত হইলেন ? আমরা তাঁহার মধ্যে। তবে সহবাস হইবেনা কেন ?

তিনি নিরাকার। নিরাকারের সহবাস কেমন করিয়া হইবে ? নিরাকারের সহবাস যেরূপ হয়, সাকারের সহবাস সেরূপ হয় না। কেননা, সাকার পদার্থের মধ্যে যতই কেন সন্নিকর্ষ থাকুক না, উহার মধ্যে আকাশের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। আমার পার্শ্বস্থ বন্ধুর মধ্যে ও আমার মধ্যে আর কিছুই ব্যবধান না থাকিলেও আকাশের ব্যবধান অবশ্য থাকিবে।

তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত বলিয়া যদি বিশ্বাস কর, তবে সহবাস হইবে না কেন ? সহবাস অর্থ কি ? সঙ্গে থাকা। নিকটে থাকা। তিনি যত নিকটে, এত নিকটে আর কে ?

কিন্তু তিনি যে নিকটে, তিনি যে সঙ্গেই আছেন, ইহা প্রকৃত ভাবে কে বিশ্বাস করে ? বৃদ্ধ বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী ; যুবা বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, বালক বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, নর নারী সকলেই বলিতেছে তিনি সর্ব্বব্যাপী কিন্তু কে প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী ?

সাকারবাদী বিশ্বাস করেন যে, মূর্ত্তিতে তাঁহার দেবতা অধিষ্ঠিত। হে ব্রহ্মোপাসক ! তোমার দেবতা কোথায় ? তাঁহাকে সকল পদার্থে কি দেখিবে না ? এই যে অসীম শূন্য ইহা কি তাঁহার সত্তায় পূর্ণ দেখিবে না ? বিশ্বাসেই সহবাস। প্রেমিক বিশ্বাসী সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসেই থাকেন।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেমাস্পদের সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি প্রেম। যাহা কিছু তোমার প্রিয়তম বন্ধু সম্বন্ধীয় তাহা প্রেমের চক্ষে দেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বন্ধুর গৃহ, বন্ধুর সন্তানগুলি, সকলই তোমার প্রেমের বিষয়।

মা তাঁহার শিশুটিকে কত স্নেহ করেন ! মাতৃস্নেহ কি গভীর ! স্নেহের এমন দৃষ্টান্ত কি জগতে কোথাও আছে ? শিশু সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সকলই মা প্রেমের চক্ষে দেখেন। শিশুর বস্ত্র, শিশুর পুতুল, সকলই মার প্রেমের বিষয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানরত্ন হারাইলে; শিশুর সামগ্রীগুলি মা বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করেন।

পতিপ্রাণা সতীর পক্ষে তাহাই। স্বামীর বস্ত্র, স্বামীর পাদুকা, স্বামীর দোয়াত, স্বামীর কলম, স্বামী সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সকলই তিনি প্রেমের চক্ষে দেখেন। বিদেশগত স্বামীর হস্তলিখিত পত্রখানি আসিলে, তিনি প্রেমাশ্রুবিন্দুতে সিক্ত করিয়া উহা পাঠ করেন। ঐ পত্রখানি গোপনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কতই আরাম লাভ করেন। পতিহস্তলিখিত লিপিখানি তাঁহার কত প্রিয় !

পরমেশ্বরের এই জগৎ। সুতরাং ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট এ জগৎ প্রেমাস্পদ। রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু সকলেই তাঁহার প্রেমাস্পদ। কেননা, সেও তাঁহার সন্তান, সেও তাঁহার প্রিয়। সেই জন্য, জগতের মহাপুরুষগণ মহাপাতকীকেও ভালবাসিয়াছেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ সেবা। যিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, তিনি স্বভাবতঃ তাঁহার সেবা করিতে ভাল বাসেন। ঈশ্বরপ্রেমিক তাঁহার প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের সেবা করিতে চান। কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা কি সম্ভব ? তাঁহার কি দুঃখ আছে, কি অভাব আছে, যে জন্য তাঁহার সেবা সম্ভব হইতে পারে ? মহাত্মা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের সেবার অর্থ তাঁহার সন্তানদের সেবা, জীবের সেবা।

যীশু বলিয়াছেন যে, অতি সামান্য ব্যক্তির সেবা করিলে আমার সেবা করা হয়। যীশুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ? সহানুভূতিতে, প্রেমে অতি সামান্য দীনহীন জনের সঙ্গে তিনি এক হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বলিয়াছেন যে, অতি দীনহীন জনের সেবা করিলে, আমার সেবা করা হয়। সামান্য দীনহীন ব্যক্তিদের সহিত তিনি প্রেমে এক হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সেবায়, অতি কাঙ্গাল দীন দুঃখীর সেবায় তাঁহারই সেবা। ভালবাসায় মানুষ এক হয়। সন্তানের সেবা করিলে কি মাতার সেবা করা হয় না ?

জগতের মাতা প্রেমেতে তাঁহার সন্তানদের সহিত এক। সুতরাং জীবের সেবায় তাঁহারই সেবা।

প্রেমের চতুর্থ লক্ষণ এই যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কথা বলিতে ভালবাসে। ভক্তজন ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিরূপে বলা হইয়াছে ;—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃপরস্পরং।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

যাঁহাদের চিত্ত আমাতে, ও যাঁহারা মদ্গতপ্রাণ, তাঁহারা আমার গুণ সকল পরস্পরকে বলেন, ও সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করেন, এবং উহাদ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

আমরা কি তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে অন্তরের সহিত ভালবাসি ? কত সময় বৃথা কথায়, পরনিন্দায় কাটিয়া যায়। জীবন নষ্ট হয়। তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার কথায়, সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে অধ্যাত্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি।

প্রেমের পঞ্চম লক্ষণ কি? অনুকরণ। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার মত চলে, ফেরে, হাসে, কাঁদে। ভক্ত সেইরূপ ভগবানের অনুকরণ করেন। ভগবানের জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ভক্তের মধ্যে ক্রমে ক্রমে আসিতে থাকে। ভক্ত তাঁহার প্রেমাস্পদের ন্যায় ক্রমে ক্রমে, অধিকতর পবিত্র, তাঁহার ন্যায় দয়াবান, তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীল হইতে থাকেন। ভক্ত ক্রমে তাঁহার মত সংসারাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন ; অথচ তাঁহারই মত সংসারের মধ্যে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে, সংসারের কার্য্য করেন। তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমে তাঁহার মত হইতে থাকেন।

প্রেমের ষষ্ঠ লক্ষণ, স্বার্থত্যাগ। আমরা কি করিতেছি? কত সৈনিক পুরুষ, সামান্য অর্থের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে যায়। আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি? কুমারী কব বলেন, কত নারী, কত পুরুষের প্রেমে পড়িয়া, আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান করিতেছে। আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি? মানুষ মানুষের জন্য যাহা করে, আমরা কি তাঁহার জন্য তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছি?

ধর্ম্মজগতের মহাত্মারা, ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের জন্য, কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, কত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা কি পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিব? সেই প্রেমময়ের প্রেমের খাতিরে প্রত্যেক সাধককে, দৈনিক জীবনে, আত্মবিনাশ সহ্য করিতে হয়। নতুবা হয় না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষশেষ

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক—তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ, শেষ বল্‌তে যে কি বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করচে—আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করচে। তোমরা এই যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করচ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি—তোমরা কেবল নিচ্চ এবং খাচ্চ—আর আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আস্‌চি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করচি,—ঘরে যা সঞ্চয় করে বসেছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না—সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে; আজ কিছু যাচ্চে, কাল কিছু যাচ্চে—অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্ব্বাচলের যাত্রী, সূর্য্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ—সেইদিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করচেন তাঁকে তোমরা পূর্ব্ব মুখ করেই প্রণাম কর। আমরা পশ্চিম অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি—সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আস্‌চে—সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্ব্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ—একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ—কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাক্‌তে পারে না। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই—একদিকে যিনি শিশুর, আর একদিকে তিনিই বৃদ্ধের। একদিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্চেন, আর একদিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্চেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষের উপাসনাকালীন বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিরাম যে কেবল কর্ম্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-কাশে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্চে। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি জগতে যা-কিছু চলে যায় ক্ষয় হয়ে যায় তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্চেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্ব্বেই আমি বলেছি তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন নূতনকে পাচ্চ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্চেই! এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তাহলে কিজন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ঙ্কর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তাহলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরত না আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্চি জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলি একটি পাওয়াতে এসে ঠেকচে—সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্চে সেখানে দেখচি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড় একটি আশ্চর্য্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাইনি পাইনি কান্নাটা থেকে যায়—অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুন্‌তে পাইনে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুন্‌তে দেয় না।

কিন্তু একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কি গভীর পাওয়া, কি বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়—তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে, যা-কিছু যাচ্চে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্চে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে—সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন নূতনকে পায় না—তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই ত পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলি আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিষ থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে সব ঘুচ্‌লেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেই জন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এই জন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে মৃত্যু আছে। যদি না থাক্‌ত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখ্‌তুম, সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলি মেঘের মত সরে যাচ্চে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্চে বলেই যিনি সরে যাচ্চেন না, মিলিয়ে যাচ্চেন না তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্চি।

তাই আমি বলচি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখ। কিছুই থাকচে না, সবই চলেছে এইটিই লক্ষ্য কর। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্চে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগচ্চে ততই দেখতে পাচ্চি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক তা অসংখ্য; কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে সমস্ত দিয়ে যাঁকে পাচ্চি তিনি এক। গেছে গেছে এ কথাটা যতই কেঁদে বলি না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠ্‌চে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগচে সেখানে ভাল করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্চে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও—দেখ, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণু-পরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু একজায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কল শব্দ নেই চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সঙ্গীতে বিলীন হয়ে রয়েছে,—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে দিয়েছেন একজন্যে আমি আমার মানব জীবনকে ধন্য মনে করছি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ যে কোল সেই বক্ষে সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করছি। একদিকে অনেককে হারিয়েও আরেকদিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাইনি, যা পেয়েছি এবং চাইনি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্য্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তাদের দুঃখ বেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠেছে—কেননা, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্ছে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি—একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই এমন অভয় আর কি হতে পারে!

আজ আমার মন তাঁকে বলছে, বারে বারে খেলা শেষ হয় কিন্তু হে আমার জীবন-খেলার সাথী, তোমার ত শেষ হয় না। ধূলার ঘর ধূলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে-তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে-তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ সেই-তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি খেলা আমার হারিয়ে যায় নি সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে; দেখতে পাচ্ছি ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করছ,—সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জ্জনায় আমাতে পদে পদে ধুলোয় উপরে পড়তে হয়—এবার সে সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠিনে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও! যত বিঘ্ন দূর কর, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্ছে সব লয় করে দাও—হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপ্নভঙ্গ।

গোপনে যা ছিল মরমে জাগিল
পরিয়া আলোক সাজ।
আঁধারের তলে মণিদের জ্বলে
ভুবনে চেতনরাজ।
এই চেতনায় নিজ ভাবনায়
যে পারে করিতে লয়
মোহ অন্ধকার কাটি দিয়া তার
ভাসে একাকারময়।
একের আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
দেখে সে আপনরূপ,
আলোকে আঁধারে হেরে বারে বারে
আপনারে অপরূপ।
ক্রমে যাওয়া-আসা আসে হয়ে ভাসা
আঁধারে হওয়া সে লীন;
এই জ্যোতিকোষে কে বাজায় বোসে
আলো আঁধারের বীণ্।
এ যে প্রাণতম আত্মা অনুপম
মানব জীবন সার।
গুপ্ত লোক হতে আলোকের পথে
ছড়ায় চেতনাধার।
হের হে আপন মরম গোপন
চরম পরম ধন।
হৃদয় ভেদিয়া উঠে প্রকাশিয়া
ভাঙিয়া মোহ স্বপন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

অন্তরের নববর্ষ।*

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করেনি—এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক্!

এই যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল—কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না,—আকাশভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল;—কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল—তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজ্‌ল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হচ্চে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি—আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যে দিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিণ বাতাসে নবীনতার আশীস মন্ত্র পড়ে দেয় সে দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনি অনায়াসে শুক্‌নো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে—ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়। এই যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু মানুষ ত পুরাতন আবরণের মধ্য থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আস্‌তে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয় বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; সেই তার অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মত আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে—এবং সেই তার প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মত দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে প্রাচীন। কেন না সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত;—যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হচ্চে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাক্‌তে পারচে না। সে আপনার শত সহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে—সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শত সহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে,—যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার রত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেল্‌তে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলচে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাক্‌লেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জ্জনা সঞ্চিত হতে থাকে—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সে গুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার—সেই জন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্ম্মস্থানে গিয়ে পড়ে—তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু, তুমি আমাকেই মারচ—বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা কর—কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করচে। প্রকৃতির কত লক্ষ কোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসঙ্গত সুসংহত করে না তুলচে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণ-

গুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা—ততক্ষণ তার যুদ্ধ অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুল্‌চে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্চে এবং সুষমার পরিবর্ত্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারিদিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্চে।

সেই জন্যে বিশ্বজগতের যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মত অবিশ্রাম চলেছে, একদিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেই জন্যেই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই—সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না—তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়—বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেই জন্যে আমি বলচি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্ম্মলতা, এই যে পাখীর কাকলীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়—যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ, যেন মনে না করি এ'কে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্ম্মলতা আমারই নির্ম্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি;—মনে যেন না করি, স্তব পাঠ করে নামগান করে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্ত্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকেও আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন এই কথাটিকে সত্য রূপে মনের মধ্যে চিন্তা কর। একবার ধ্যান করে দেখ সেই নববর্ষের কি ভীষণরূপ! তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বল্‌চে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্ব্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মত বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখীর গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে—আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন—তিনি তাকে সহজ জীবন দেননি। সেই জন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়;—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলচি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষকে পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে ত সহজ দান নয়। আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি, তবে মাথা তুল্‌তে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি, তোমার এ ভার বহন করতে পারিনে প্রভু,—মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর!

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন তাইত মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্ম্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্যেই তার উপরে এত দাবি। এই জন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব্ব করে চল্‌তে হয়, এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ!

মানুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে—তখনি বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর! তখনি তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর ত সে ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চল্‌তে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও! একটি দরজার পর আরেকটি দরজা ভাঙ, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ কর,—তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক্!

এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র—সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্ব্বল-কণ্ঠে বলি, আমার বল নেই সেইটেই আমার মোহ। দুর্জ্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনি-

কে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শাণিত অস্ত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে জ্বল্‌চে। সে সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়চি; ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষত বিক্ষত করচে। এ সমস্ত ত সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এস, এস, দলে দলে বাহির হয়ে পড়—নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্ব্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠেছে—সমস্ত অবসাদ কেটে যাক্, সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধূলোর লুটিয়ে পড়ে যাক্—জয় হোক্ তোমার, জয় হোক্ তোমার প্রভুর।

না, না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সাম্‌নে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ কর।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্ত্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু যুদ্ধ চল্‌চে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি—তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সঙ্গীত বাজিয়ে তুলেছে—তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্ম গ্রহণ করেছি; তোমার এত দান এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে শান্তি চাইতে দাঁড়াইনি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকাবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, ততই তোমার আদেশ আরো তীব্র, আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেন না, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাক্‌বে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও! পাঠাও তোমার মৃত্যুদূতকে ক্ষতিদূতকে! জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে—সে ত সহজে মোচন করা যাবে না—তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু কত মিথ্যা আর বল্‌ব, বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব, বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক্—সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র কর। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক তাহলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তাহলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব—তাহলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠের ভূমিকা।

সাংখ্যের গোড়াতেই আছে, দুঃখনিবৃত্তি কি উপায়ে হইতে পারে তাহারই জিজ্ঞাসা—তাই গতবারে ঐ কথাটির পর্য্যালোচনা যত পারি সংক্ষেপে সমাধা করিয়া তাহারই উপরে আমার চরম বক্তব্য কথাটির গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম। আজ যাহা বলিব তাহাও ভূমিকারই মধ্যে ধর্ত্তব্য।

শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, ভূমিকা সমগ্র অট্টালিকা নহে—তাহা ভিত্তিমূল মাত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আর অট্টালিকার দোষগুণ-বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারস্থলে কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা শোভা পায়; তাহা এই যে, ভিত্তিমূল দৃঢ় কি অদৃঢ়; তা বই ভিত্তিমূল সুশ্রী কি বিশ্রী, অথবা বাসের উপযোগী বা অনুপযোগী এরূপ জিজ্ঞাসা শোভা পায় না। কিন্তু ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন গৃহনির্ম্মাতার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার হাতের এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যটি চুকাইয়া ফেলিয়া মনকে হাল্‌কা করিবার জন্য—দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে গতবারে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম তাহা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা না করিলে

সেদিনকার কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি অনেকে অনেক প্রকার ভুল বুঝিবেন।

মনুষ্যের দুঃখ বেশীর ভাগ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। শারীরিক রোগ বরং মনুষ্যের গায়ে সহে, কিন্তু মানসিক শোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহার বিষানল লোককে—বিশেষতঃ অবলা লোককে—পাগল করিয়া ছাড়ে। একে তো তাহাকেই সাম্‌লানো ভার, তাহাতে সে আবার সঙ্গী যুটাইয়া আনে শারীরিক রোগের দল কে-দল। পাপজনিত আত্মগ্লানি আবার সকলকে জিতিয়াছে। তাহা যে কিরূপ ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য অন্তর্দাহ, মহাকবি সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ্ এবং তাঁহার সহপাপিনী লেডি ম্যাক্‌বেথ্ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার, প্রেমপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মাধিষ্ঠিত বিচ্ছেদানলের দহনজ্বালার সহিত মৃত্যুর যে কতটা নিকট সম্বন্ধ, ঐ মহাকবির রোমিও জুলিয়েট্ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাকি রাখে নাই। তা ছাড়া, জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ, এবং ব্রাহ্মণ-পুত্র চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘাঁাসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক-আধ জন অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর-আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অতলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। আত্মার এই গোড়াঘাঁাসা দুঃখের নিবৃত্তির নামই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি—কেননা এই দুঃখ নিবারিত হইলেই মনুষ্যের আর কোনো দুঃখ থাকে না।

গতবারে গোড়াতেই আমি সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে তাহার ভিতরের মর্ম্মকথাটি টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহাকেই বা আমি বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা, কাহাকেই বা বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার, সে কথাটি আমার মনের মধ্যে চাপা রহিয়া গিয়াছে; তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে কাপিল দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য, এবং পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তা বলিয়া তাহা দুই সাংখ্য নহে—পরন্তু একই সাংখ্যের আগেরটি বীজ এবং শেষেরটি ফল। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে "সাংখ্য যোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" সাংখ্য স্বতন্ত্র এবং যোগ স্বতন্ত্র এ কথা বালকেরাই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। "একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্রকে যাঁহারা একেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখেন তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। ভগবদ্গীতার এই কথাটির মর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া আমি কাপিল দর্শনকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা বা বীজ; যোগশাস্ত্রকে বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার বা ফল। বীজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফল ফলাইয়া তোলা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন ফলার্থী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না, তেমনি নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তোলা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসুব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত স্মৃতিপুরাণ এবং বিশেষতঃ পাতঞ্জল দর্শন, কপিল মুনির নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তুলিয়া সাংখ্য দর্শনের সার্থক্যসম্পাদন করিয়াছে।

কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখদুঃখাদি গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা। প্রকৃতি অবিদ্যা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে মুক্তি-ধামে পৌঁছাইয়া দ্যান্। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার পথই অবলম্বনীয়, তত্ত্ববিদ্যাই ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু বিদ্যা পদার্থটা কি? কাপিল সাংখ্যের মতে তাহা আর কিছু না, প্রকৃতিকে আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা; আর উহার মতে, ঐ প্রকার বিদ্যার পরিপক্ক অবস্থায় জীবাত্মার বুদ্ধির অভ্যন্তরে যখন এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হয় যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং সে আপনি স্বতন্ত্র, তখন তাহারই বলে জীবাত্মা সমস্ত সুখদুঃখাদির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতির আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র পন্থা। কপিল মুনির এই মোট মন্তব্য কথাটি যদি বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কথাটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু উহাতে আমাদের দেশের তত্ত্বপন্থীদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। কেয়া-

পনিষদে আছে যে, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; আবার, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ—তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত। প্রকৃত কথা এই যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রদর্শিত শুষ্ক জ্ঞানের পথ পুরুষার্থরূপী চরম গম্যস্থানে পৌঁছিবার পক্ষে ব্যাঘাত-জনক বই সুবিধাজনক নহে।

সাংখ্যের মতে বিদিতব্য তত্ত্ব সবিস্তারে বলিতে গেলে পঁচিশটি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটি,—ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত জগৎ এবং জ্ঞাতা পুরুষ। নিশাবসানে শয্যা হইতে গাত্রোত্তোলন করিবার সময় প্রতিদিনই আমরা ঐ তিনটি তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হই'ত ব্যক্ত হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগৎ, কারণরূপী অব্যক্ত জগৎ এবং দর্শকরূপী আপনি এই তিনটি মৌলিক তত্ত্ব আমাদের সাক্ষাৎজ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে সহজেই এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, এই যে প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিদিনই উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে—ইহার প্রকরণ পদ্ধতিইবা কিরূপ? আর ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কি? প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্ত হইবার সময় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া স্থূল হইতে স্থূলে অনুলোমক্রমে অভিব্যক্ত হয়; এবং অব্যক্ত হইবার সময় স্থূল হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে প্রতিলোমক্রমে পর্য্যবসিত হয়। চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি আপনার অধিষ্ঠাতা দ্রষ্টাপুরুষের ভোগ এবং মুক্তির উদ্দেশেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে জ্ঞাতা পুরুষ প্রকৃতির কে, যে, তাহার ভোগমোক্ষের উদ্দেশে কার্য্য না করিয়া প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না? সাংখ্যদর্শনে ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, দুগ্ধ পানের জন্য বাছুরকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিলে গাভীর স্তন হইতে যেমন আপনাআপনি দুগ্ধক্ষরণ হইতে থাকে, সেইরূপ অধিষ্ঠাতা পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিল মুনির এ কথাটা সমীচীন নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথা-প্রসঙ্গে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে তিন প্রকার—বিজাতীয় ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, ঐক্যও তিন প্রকার,—বিজাতীয় ঐক্য, স্বজাতীয় ঐক্য এবং স্বগত ঐক্য। অচেতন বৃক্ষ এবং সচেতন জীবের মধ্যে প্রাণবত্তাঘটিত ঐক্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিজাতীয় ঐক্য, এবৃক্ষ এবং ওবৃক্ষের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বজাতীয় ঐক্য, আর, বৃক্ষ এবং শাখাপত্রের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বগত ঐক্য। শেষোক্ত স্বগত ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ঐক্য তাহাতে আর ভুল নাই। বাছুর যখন গোরুর গর্ব্ভে বিলীন ছিল, তখন উভয়ের মধ্যে স্বগত ঐক্য ছিল আত্যন্তিক; আর বৎস প্রসবের পর হইতে সেই স্বগত ঐক্যের টান, সোজা কথায় রক্তের টান, উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে; এই জন্যই বাছুরকে দুগ্ধপানার্থে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে গোরুর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে। কিন্তু কাপিল সাংখ্যে প্রকৃতি এবং জ্ঞাতাপুরুষের মধ্যে যখন ওরূপ স্বগত ঐক্যের বন্ধন স্বীকৃত হয় নাই, তখন কেন যে জ্ঞাতাপুরুষের ভোগমোক্ষ সাধনের জন্য প্রকৃতি হইতে জগৎকার্য্য অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে থাকিবে—ইহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাপিল সাংখ্যের ঐ অঙ্গহীন কথাটির অঙ্গপূরণের জন্য এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রেই প্রকৃতি ঐশীশক্তিরূপে প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। কাপিল দর্শনের মত যাহাই হউক্ না কেন, কিন্তু আমাদের দেশের আরআর সকল শাস্ত্রেরই ভিতরের কথা এই যে, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে মর্ম্মান্তিক প্রাণের টান রহিয়াছে, আর তাহারই প্রবর্ত্তনায় জগৎসংসারের কার্য্য চলিতেছে।

দর্শনমহলের বাদবিতণ্ডা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা যদি আমাদের প্রাণের টানের মধ্য দিয়া সাংখ্যের ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনটি মূলতত্ত্বের প্রতি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি, তাহা হইলে মাতৃক্রোড়স্থিত বালক যেমন মুখে কথা বলিতে না জানুক্ কিন্তু মনে মনে এটা বেস্ জানিতে পারে যে, আমি মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছি, তেমনি আমরা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানকালে যখন আমাদের আপনা-আপনাকে লইয়া এই পরমাশ্চর্য্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, তখন আমরা আমাদের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা স্বভাবের সহিত একযোগে পরমাত্মার পিতৃভাব এবং মাতৃভাবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করি। এবিষয়ে আমি অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইটুকু কেবল বলিতে ইচ্ছা করি

যে, আমরা আমাদের আপনার অভাবের বলে এবং পরমাত্মার প্রভাবের বলে পরমাত্মার পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করি—তা বই, যুক্তি তর্কের বলে নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আর, এখনও বলিতেছি যে, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই ঐশী শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাহার মধ্যে অবিদ্যা জীবাত্মার অভাবের পরিচায়ক, বিদ্যা পরমাত্মার প্রভাবের পরিচায়ক। পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলিতে বুঝায়, আপনার অজ্ঞানময় অভাব এবং পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় প্রভাব, এই দুই তত্ত্বের একসঙ্গে উপলব্ধি। কঠোপনিষদের সেই বচনটি যাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—যথা, যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, আবার, যাহারা বিদ্যায় রত তাহারা আরো ঘোরতর অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, এই বচনটির পরেই উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যাঁহারা একসঙ্গে জানেন, তাঁহারা অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অজ্ঞান শক্তিহীন এবং নিরাশ্রয় এই তত্ত্বটি যখন আমরা নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া মনোমধ্যে উপলব্ধি করি, তখন তাহারই নাম মৃত্যুকে অতিক্রম করা; আর সেই সঙ্গে যখন পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় আনন্দময় প্রভাব উপলব্ধি করি তখন তাহারই নাম অমৃত লাভ করা: পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অসহায় এই অভাববোধটি যখন আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে, তখন গাভীর স্তন হইতে যেমন স্নেহামৃত ক্ষরিত হইয়া ক্ষুধাতুর বৎসের অভাব ঘুচাইয়া দ্যায়, সেইরূপ পরমাত্মার প্রেমপূর্ণ প্রভাব হইতে করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুঃখ ঘুচাইয়া দ্যায়।

কাপিল সাংখ্যের উপদিষ্ট জ্ঞানপথ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ক্রমে যোগশাস্ত্রের একটি উচ্চ সাধন-পথে উপনীত হইলাম। কাপিল সাংখ্যের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইবে এরূপ কঠোর ভাবে যে, প্রকৃতি ভয়ে এবং লজ্জায় সাধকের নিকট হইতে সরিয়া পলাইতে পথ পাইবে না। যোগের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, মনকে এমন এক স্থানে দৃঢ়রূপে বসাইতে হইবে যেখানে স্থিতি করিলে কোনো দুঃখই সাধককে নাগাল পাইবে না। কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের উপদিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সাধনের পথ হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান কাহাকে বলে?—ভোজরাজকৃত পাতঞ্জলভাষ্যে তাহা লিখিত হইয়াছে এইরূপ:—প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। প্রণিধান কি? না বিশেষ প্রকার ভক্তি, বিশিষ্টরূপে উপাসনা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তীতি প্রণিধানং—বিষয়সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর চরণে প্রণিহিত করা হইতেছে, এই অর্থে প্রণিধান। কাপিল দর্শনের সাধনাঙ্গকে মোটামুটি জ্ঞানযোগ বলা যাইতে পারে, পাতঞ্জল দর্শনের নিম্ন সোপানের সাধনাঙ্গকে কর্ম্মযোগ বলা যাইতে পারে, এবং পাতঞ্জল দর্শনের উচ্চ সোপানের সাধনাঙ্গকে ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতে জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগে এবং কর্ম্মযোগ হইতে ভক্তিযোগে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ যেমন অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্যের সহিত বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুফী ধর্ম্মমত।

বাহির হইতে দেখা যায় যে সুফীধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত সুফীরা সকল ধর্ম্মকেই উত্তম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে; তাহাদের মত এই যে, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে সমস্ত ধর্ম্মই সেই নিখিলের কেন্দ্রস্থিত মহাসত্যের উপলব্ধির পথে চলিয়াছে এবং তাহারই ছায়ামাত্র। অবশ্য সত্যের প্রকাশের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের গৌরবেরও তারতম্য তাহারা স্বীকার করে। একটি সুফীসূত্রে আছে 'মানবসন্তানের যতবার শ্বাস প্রশ্বাস বহে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার পথ ততগুলি আছে।" এই কারণে সুফীধর্ম্মকে পরধর্ম্মসহিষ্ণু এবং সারগ্রহণশীল ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার মধ্যে অনেক সময়ে যে বিশ্বাসের দৌর্ব্বল্য ও ঔদাসীন্য দেখা যায় তাহা সুফীধর্ম্মের মধ্যে নাই এবং উহা নিজেকে অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে নিজের গ্রহণোপযোগী করিয়া লয়।

সুফীরা বলেন "প্রভুই এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহারা নিজের চেষ্টায় নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" কোনও বিশ্বাস, কোনও ধর্ম্ম, কোনও পদ্ধতি কখনও বহুকালস্থায়ী হইতে পারে না যদি তাহার মধ্যে সকল পদ্ধতির, সকল ধর্ম্মের এবং সকল বিশ্বাসের প্রাণস্বরূপ সেই সত্যের

আলোক অন্তত কিছু পরিমাণ না থাকে। যাহার দৃষ্টি আছে সে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতেই শিখিবার উপযোগী বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। সকল ধর্ম্মেরই একটা চরম উদ্দেশ্য আছে এবং সকলেই সেই এক বস্তুরই সন্ধানে প্রবৃত্ত। সুফীভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'প্রেমিক অনেক বটে কিন্তু প্রিয় সেই এক।"

ফরিদুদ্দিন অত্তর তাঁহার রচিত "পাখীর ভাষা" নামক একটি রহস্যময় (mystical) কবিতায় লিখিয়াছেন যে সেই রহস্যময় সিমুরগ্ পাখী (ঈশ্বরের রূপক নাম) চীনদেশের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এবং ডানা হইতে একটি পালক খসাইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিল। সেই একটি পালকে সমগ্র চীনদেশ আনন্দে এবং বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিল, এবং যে-কেহ তাহা দেখিতে পাইল সকলেই তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ নিজের কাছে রাখিবার জন্য লেখয় এবং চিত্রে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিল। সেই জন্যই মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছিলেন 'জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য চীনদেশেও যাইবে' কারণ, কোন দেশ যদি সুদূর কিংবা জঘন্যও হয় তথাপি সকলে যে সত্যের অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে তাহার নিদর্শন সেখানেও পাওয়া যাইবে।

উমার খাইয়াম লিখিয়াছেন "দেব-দেবীর মন্দির এবং কা-আবা দুই-ই উপাসনার মন্দির; গির্জ্জার ঘণ্টাও উপাসনার বন্দনা গান; কটিবন্ধ এবং গির্জ্জা, মালা এবং ক্রুস্ এই সমস্তই বস্তুত সেই একের উপাসনার চিহ্ন।"

"সবিস্তার" সহরের মাহমুদ তাঁহার রচিত 'রহস্যের গোলাপকুঞ্জ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এমন কি, পৌত্তলিকধর্ম্ম হইতেও তত্ত্ব লাভ করা যায়। তিনি বলেন "মূর্ত্তি যে বস্তুত কি, তাহা যদি মুসলমানেরা জানিতে পারিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে পৌত্তলিকতার মধ্যেও সত্য আছে।" হাফিজ বলেন "আত্ম-উপাসনা অপেক্ষা অন্য যে-কোনও বাহ্য পদার্থের পূজা করা ভাল; কারণ ইহার দ্বারা উপাসক অন্তত আপনা হইতে নিজেকে সর্ব্বজনরচিত এবং গীত অথচ অবর্ণনীয় সেই একের দিকে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হয়।"

যাঁহারা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে রত তাঁহাদিগের প্রধান এবং প্রকৃত গুণ এই যে তাঁহারা প্রেমিক; প্রেম না থাকিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেননা, অন্য কোন গুণ কিছু কাজেই আসিত না। জামি বলেন—

"হও গো প্রেমের ক্রীতদাস, এই লক্ষ্য রেখো সদা স্থির।
ইহাই পরমধন, কহিছেন যাঁরা জ্ঞানবীর।
আত্ম-মুক্তি তরে বাঁধ আপনারে প্রেমের বন্ধনে;
দাসত্বের চিহ্ন ধর বক্ষে, রবে আনন্দিত মনে।
প্রেমের মদিরা পানে হও প্রাণবান. আত্মহারা,
আর সবে অচেতন, মৃত, আত্মসুখান্বেষী যারা।
প্রেমের মধুর স্মৃতি প্রেমিকেরে তোলে মাতাইয়া;
প্রেমের বিজয়গীতি কণ্ঠে তার উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
আনন্দে প্রেমিক যবে প্রেমের মহিমা করে গান,
সুন্দর সে প্রজাপতি, সুকণ্ঠ কোকিল পায় স্থান
সে সঙ্গীতে। পৃথিবীতে যতই করম কর কেন
আমিত্ব নাশিতে প্রেম একমাত্র ইহা ধ্রুব জেনো।
পৃথিবীর প্রেম হতে মায়া বলে' ফিরায়োনা মুখ!
তোমারে লইয়া যেতে চিরন্তন সত্য অভিমুখ
ইহাও সহায় হবে। অক্ষরের ধারণা না হলে
রীতিমত, কোরাণ কণ্ঠস্থ কোন্ বলে
করিতে হইবে বল? একজন জ্ঞানীর সকাশে
শিষ্য এক গন্তব্য পথের কথা আসিয়া জিজ্ঞাসে;
তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'তোমার পথের
প্রেমের পন্থার সাথে ভেদ যদি রয়েছে মতের
তবে তুমি যাও ফিরে। আগে প্রেমশিক্ষা কর লাভ
তার পরে এসো হেথা! কেমনে করিবে সেই ভাব-
সুধা রস-ধারা পান, বাহ্যরূপ ঘট হতে যদি
মধু করিবারে পান ভীত তুমি হও নিরবধি?
কিন্তু দেখো সাবধান, বাহিরে রূপের প্রলোভনে
লুব্ধ হয়ে পথে বসি বিলম্ব কোরোনা অকারণে।

এখন দেখা যাইতেছে আসল কথা হইতেছে এই যে নিজেকে আমিত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাটাই চরম লক্ষ্য; যতক্ষণ না এই শিক্ষা লাভ হইবে ততক্ষণ অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। উপাসনা, প্রেম, নির্ব্বিচার ভক্তি, এ সমস্তই যত পরিমাণে অহঙ্কার বিলোপের সহায়তা করে তত পরিমাণেই ভাল। এই আমিত্বই সমস্ত পাপ এবং দুঃখের মূল। যাঁহারা এই রোগের যথার্থ প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে অহংই সকল দুঃখের মূল কারণ।

এই আমিত্বই যে সাক্ষাৎ স্বরূপে সমস্ত পাপের কারণ সমস্ত খাটি ধর্ম্ম মাত্রই এই সুস্পষ্ট সত্যটি স্বীকার করিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই আমিত্বটা কি বস্তু এবং কেমন করিয়াই বা তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে। এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে, ঈশ্বর কি, জগৎ কি, এবং অমঙ্গল কাহাকে বলে এইগুলির সম্বন্ধে সুফীদিগের ধারণা কিরূপ তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ এই প্রকৃতির অতীত

কোন অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব সুফীদিগের মধ্যে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাহ্য জগতের নিত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ থাকিতেও পারে এবং আছেও, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের নিকট কেবল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য বস্তু তাহা নহে, তিনি এক মাত্র নিত্য বস্তু। সুফীর নিকট জাগতিক যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ। "এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার গুণ গান না করে।" তিনি সর্ব্বত্র এবং সকলের মধ্যে আছেন, "আমার কণ্ঠস্থিত তৈজস-নালী অপেক্ষা তিনি আমার নিকটতর" এবং এত সুস্পষ্ট বলিয়াই তিনি অদৃশ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় একজন সুফী বলিয়াছেন "ঈশ্বর কি নয় তাহাই তুমি আগে বল, পরে তিনি কি তাহা আমি দেখাইয়া দিব।" মাহমুদ্ বলেন "জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত আত্মার নিকট সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরম ঈশ্বরের প্রত্যরূপে প্রতিভাত হয়। এবং জামী বলেন—

"কেবলাত্মা তুমি একা, আর যাহা সবই ছায়াপ্রায়,
বিচিত্র এ ত্রিভুবন তোমাতেই এক হয়ে যায়।
বিশ্বচিত্তবিমোহন মাধুরীর পূর্ণতার তরে
সহস্র দর্পণ মাঝে তব প্রতিবিম্ব আসি পড়ে।
কিন্তু তুমি এক, তব সৌন্দর্য্যই বিচিত্র সুন্দর;
অনুপম, অতুলন, এক তুমি মনোমুগ্ধকর।"

বারান্তরে সুফী কবিদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

(ষষ্ঠ উপদেশের অনুবৃত্তি)

আরাধনার যে প্রবৃত্তিটি, আত্মার নিভৃত মন্দিরে অধিষ্ঠিত, তাহাই আভ্যন্তরিক আরাধনা, তাহাই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি।

যে হিসাবে, জন সমাজ, রাজ্যশাসনতন্ত্র, ভাষা ও শিল্পকলাদি-মানুষের স্বেচ্ছাসাপেক্ষ—সামাজিক উপাসনা-প্রণালী তাহা অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। এই সকল ব্যাপারের মূল, মানব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আরাধনার প্রবৃত্তিটিকে যদি তাহার নিজের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, হয়—উহা নিষ্ফল ধ্যানে ও উন্মত্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া সহজেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, নয়—সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও দৈনন্দিন প্রয়োজনসমূহের প্রবল প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া যায়। আরাধনার আবেগ যতই প্রবল হয় ততই উহা কতকগুলি ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তখন আরাধনা একটা প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত আকার ধারণ করিয়া, যে হৃদয়-ভাব হইতে গোড়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হৃদয়-ভাবের দিকে আবার ফিরিয়া যায়। তখন আরাধনার প্রবৃত্তিটা একটু নিদ্রালু হইলে, আরাধনার সেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে; ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে; এবং দুর্ব্বল ও নিরঙ্কুশ কল্পনা-প্রসূত সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হইতে উহাকে রক্ষা করে। অতএব দর্শনশাস্ত্র, আভ্যন্তরিক আরাধনার ক্ষেত্রেই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক ভিত্তি স্থাপন করে।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্র পরমার্থবিদ্যার স্থান দখল করিয়া বসিবে, দর্শনশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে; দর্শনশাস্ত্র আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্য কি?—না, যাহা কিছু মানুষকে উন্নত করিতে পারে, তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহার সহায়তা করা।

সেই প্রকৃত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম ঘোষণা করে—ঈশ্বর এক, সমস্ত মানব-জাতি এক, ঐশ্বরিক বিধানের নিকট সকল আত্মাই সমান,—এবং এইরূপে রাষ্ট্রিক একতারও ভূমি প্রস্তুত করে; যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—মানুষ শুধু অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে না, মানুষ শুধু আপনার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যেই—আপনার শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; মানুষের আত্মা আছে,—স্বাধীন আত্মা আছে; নভোমণ্ডল-পরিব্যাপ্ত অসংখ্য লোক অপেক্ষা, এই আত্মার মূল্য সহস্রগুণে অধিক; এই জীবন পরীক্ষাস্থলমাত্র, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুখ নহে, সৌভাগ্য নহে, পদ-মর্য্যাদা নহে। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে সংশোধন করিতে হইবে, আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে; সংসারের কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত দর্শনের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন, যুগপৎ স্বাভাবিক ও আবশ্যক। স্বাভাবিক এই জন্য—উভয়েই যে সকল সত্য স্বীকার করে তাহার ভিত্তি একই; আবশ্যক এই জন্য—উভয়ের দ্বারাই বিশ্বমানবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে। ধর্ম্ম এবং দর্শনকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখা—একদেশদর্শী, মতান্ধ, ধর্ম্মোন্মত্ত লোকদিগের কাজ। কিন্তু যাঁহারা

দর্শনের কিংবা ধর্মের প্রকৃত অনুরাগী, তাঁহারা দর্শন ও ধর্মের মধ্যে ভেদ না ঘটাইয়া যাহাতে উভয়ে একত্র সম্মিলিত হয় তৎপ্রতি চেষ্টা করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, ধর্ম ও দর্শন প্রত্যেকেই আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া, সেই একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়,—অর্থাৎ বিশ্বমানবের নৈতিক মাহাত্ম্য প্রতিপাদন ও সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে।

সমাপ্ত

দাদূ।

প্রথম অঙ্গ।

২০

দেবই কিরকা দরদকা
টূটা জোরই তার॥

(তিনিই) বেদনার দেন আঘাত, তিনিই যুক্ত করেন ছিন্ন তন্ত্রী।

২১

দাদূ সাঁচা গুরু মিলা
সাঁচা দিয়া দেখাই।
সাঁচাকো সাঁচা মিলা
সাঁচা রহা সমাই॥

হে দাদূ সাচ্চা মিলিলেন গুরু, সাচ্চা দিলেন দেখাইয়া। সাচ্চার সহিত মিলিলেন সাচ্চা, সাচ্চায় রহিলেন সমাহিত হইয়া।

২২

দাদূ প্যালা প্রেমকো
মহারস মাতা॥

দাদূ প্রেমরসের প্যালা, এই মহারসেই (স্বামী) মত্ত।

২৩

অমর অভয় পদ পাইয়ে
কাল ন লাগই কোই।

অমর অভয় পদ হও প্রাপ্ত, লাগিতে পারে না কোনো কাল (মৃত্যু)।

২৪

অনেক চন্দ্র উদয় করই
অসংখ সূর প্রকাস।
এক নিরংজন নাম বিন
দাদূ নহী উজাস॥

অনেক চন্দ্র করে যদি উদয়, অসংখ্য সূর্য্য করে যদি প্রকাশ, তথাপি এক নিরঞ্জনের নাম বিনা, হে দাদূ, উজ্জ্বল নাহি হয়।

২৫

কধি যহ আপা জাইগা
কধি যহ বিসরই ঔর।
কধি যহ সূছিম হোইগা
কধি যহ পাবই ঠৌর॥

কবে এই "অহম্" যাইবে মিটিয়া, কবে এই "পর" হইয়া যাইবে বিস্মৃত, কবে "এই" (অহম্) হইয়া যাইবে সূক্ষ্ম, কবে "এই" (অহম্) প্রাপ্ত হইবে ঠাঁই?

২৬

নৈন ন দেখই নৈনকো
অংতর ভী কুছ নাহি।
সতগুরু দরশন কর দিয়া
অরস পরস মিলি মাহিঁ॥

নয়ন নাহি দেখে নয়নকে, অন্তরেতেও কিছুই যায় না দেখা; সদ্‌গুরু হাতে দিলেন দর্পণ, অন্তরেতেই মিলিল অরস, অন্তরেতেই মিলিল পরস।†

২৭

ঘট ঘট রামহি রতন হৈ
দাদূ লখৈ ন কোই।

ঘটে ঘটে বিদ্যমান রামরতন,
হে দাদূ, লক্ষ্য করে না কেহই।

২৮

জবহী কর দীপক দিয়া
তব সব সূঝন লাগ॥

যখনই হাতে দিলেন দীপক,
তখনই সবই যাইতে লাগিল দেখা।

২৯

মনমালা তহঁ ফেরিয়ে
দিবস ন পরসই রাত।
তহাঁ গুরু বানা দিয়া
সহজে জপিয়ে তাত॥

---

* অসীম যখন অসীমরস পান করিতে চান তখন সীমার পাত্র চাই। আমার "অহং" এই জন্য এক মহামূল্য বস্তু। এই "অহম্" প্যালা দ্বারাই ব্রহ্ম বিশ্বরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত।

† একের মধ্যে অন্যের সমাহিত হওয়াকে বলে 'অরস', 'অরস' হইলে কোন জ্ঞান ও রসই থাকে না; কিন্তু ব্রহ্মে 'অরস' হইলেই 'পরস' মেলে। ইহাই ব্রহ্মযোগের বিশেষত্ব। 'পরস' অর্থ ব্রহ্মকে স্বাদে রসে সম্ভোগ করা; অন্যকে স্পর্শ করা। ব্রহ্ম ও ভক্তে সমাধি ও সম্ভোগ একই সঙ্গে কী এক গভীর ভাবে সুসঙ্গত।

মনমালা সেখানে কর জপ, যেখানে দিবসকে নাহি পরশ করে রাত্রি। সেখানে গুরু দিলেন সূত্র, সহজেই কর তাহাতে জপ।

৩০

মন মালা তহঁ ফেরিয়ে
প্রীতম বৈঠে পাস।
অগম গুরুতেঁ গম ভয়া
পায়া নূর নিবাস॥

মন মালা কর সেখানে জপ, যেখানে প্রিয়তম বসিয়াছিল পাশে; গুরুর কৃপার অগম্য হইলেন গম্য, জ্যোতির নিবাস গেল পাওয়া।

৩১

মন মালা তহঁ ফেরিয়ে
আপই এক অনংত।
সহজই সো সতগুরু মিলা
যুগ যুগ ফাগ বসংত॥

মন মালা কর সেখানে জপ, যেখানে আপনিই একা অনন্ত। সহজই মিলিয়াছেন সেই সদ্‌গুরু,—(অতএব মিলিয়া গেল) যুগ যুগ ফাগ ও বসন্ত উৎসব।

৩২

সতগুরু মালা মন দিয়া
পবন সুরতিসো পোই॥
বিনা হাত নিস দিন জপই
মরম জাপ যোঁ হোই॥

সতগুরু মালা দিলেন মন, (সাধক) গাঁথিল তাহা পবন সুরতি * দ্বারা; বিনা হাতে নিশি দিন চলিয়াছে জপ, এমন করিয়াই হয় মরম জাপ।

৩৩

মন ফকীর মাহেঁ হুআ
ভীতরি লীয়া ভেথ।
সবদ গহই গুরুদেবকা
মাঁগই ভীথ অলেথ॥ †

অন্তরের মধ্যেই মন হইল ফকীর, ভীতরেই লইল দীক্ষা। গ্রহণ করিল গুরুদেবের শব্দ, অলেথ মাগিল ভিক্ষা।

৩৪

মন ফকীর সতগুরু কিয়া
কহি সমঝায়া গ্যান।
নিহচল আসন বৈঠিকর
অকল পুরুষকা ধ্যান॥

সদ্‌গুরু করিলেন মনকে ফকীর, কহিয়া বুঝাইলেন জ্ঞান, (মন এখন) নিশ্চল আসনে বসিয়া, (চলিয়াছে) অখণ্ড এক পুরুষের ধ্যান।

৩৫

মন ফকীর ঐসে ভয়া
সত গুরুকে পরসাদ।
জহঁকা থা লাগা তহাঁ
ছুটে বাদ বিবাদ॥

সদ্‌গুরু প্রসাদে মন হইল এমন ফকীর, যে সে যেখানকার সেখানেই রহিল লাগিয়া, ছুটিয়া গেল বাদ বিবাদ।

৩৬

না ঘর রহা না বন গয়া
না কুছু কিয়া কলেস।
দাদূ মনহী মন মিলা
সদগুরুকে উপদেশ॥

না রহিল ঘরে, না গেল সে বনে, না কিছু করিল সে ক্লেশ। হে দাদূ মনেতেই মিলিয়া গেল মন, সদ্‌গুরুর এমন উপদেশ।

৩৭

অহ নিশি লাগা এক সোঁ
সহজ সুরত রস খাই।

অহর্নিশি লাগিয়া রহিল একেরই সঙ্গে, সম্ভোগ করিতে লাগিল সহজ সুরতি রস।

৩৮

ভীতরি সেবা বন্দগী
বাহর কাহে জাই॥

ভিতরেই সেবা ভিতরেই প্রণাম, বাহিরে যাইব কেন?

৩৯

দাদূ মংঝেহী চলা
মংঝেহী উপদেস।
বাহর ঢূঢ়হিঁ বাবরে
জটা বঁধায়ে কেস॥

অন্তরেই চলিল দাদূ অন্তরেই (গুরুর) উপদেশ। বাহিরে খুঁজিয়া মরে পাগল, জটায় বাঁধিয়া কেশ।

৪০

দাদূ পরদা ভরমকা
রহা সকল ঘট ছাই

দাদূ ভ্রমের পরদা সকল ঘটকে রহিয়াছে ছাইয়া।

* সুরতি বলিলে প্রেম, আনন্দ, স্ফূর্তি ও শৃঙ্খলার একটী গভীর সমাবেশ বুঝায়।

† অলেথ যাহা বর্ণনা করিয়া রেখায় লেখায় বুঝান যায় না।

৪১

মন লেই মারগ মূল গহি
সতগুরুকো পরমোধ ॥

মনকে পথে লইয়া মূল গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুরুর প্রবোধ (লাভ করিয়াছি)।

৪২

এতা কীজই আপতেঁ
তন মন উনমন লাই।
পংচ সমাধি রাথিয়ে
দুজা সহজ সুভাই ॥

আপনা হইতে এতটুকু কর যে, তনু মন কর উন্মনা, পঞ্চকে কর সমাহিত, (তাহা হইলে) দ্বিতীয় (যে টুকু হইবার) সহজেই (তাহা) উঠিবে প্রকাশিত হইয়া।

৪৩

জহবাঁতে মন উঠি চলই
ফেরি তহাঁহী রাখি ॥

যেথান হইতে উঠিয়া মন চলে, আবার সেথানেই তাহাকে দেও রাখিয়া।

৪৪

তনহীসোঁ মল উপজঈ
মনহী সোঁ মল ধোই ॥

মন হইতেই মল হয় উৎপন্ন। মন দিয়াই কর তাহা ধৌত।

৪৫

ঘর ঘর ঘট কোলহূ চলাই
অমী মহারস জাই ॥

ঘরে ঘরে চলিয়াছে আকারের ঘানী, অমৃত মহারস চলিয়া যায় বহিয়া।*

৪৬

সাহিবকো ভাবই নহী
সো হমতে জিনি হোই।

স্বামীকে চাহিবে না আমার অন্তর, সেটা আমার দ্বারা হইতেই পারে না।

৪৭

হৌ কী ঠাহ রহৌ কহৌ
তন কী ঠাহর তৌন।
জীকী ঠাহর জী কহৌ
গ্যান গুরুকা পৌন ॥

"আমির" আশ্রয় বল "আছি", (১) "তনু"র আশ্রয় "তাহা," (২) "জীবনের" আশ্রয় বলে "জীবন"; (৩) এই জ্ঞান গুরুর নিশ্বাস। (৪)

৪৮

সোনেসেতীঁ বৈ ক্যা
মরই ঘনকে ঘাই।
দাদূ কাটি কলংক সব
রাখই কণ্ঠ লগাই ॥

সোনার সঙ্গে কি শত্রুতা যে ক্রমাগতই তাহাকে মারিতেছে ভীষণ হাতুড়ির আঘাত। সব কলঙ্ক কাটিয়া দাদূ তাহাকে রাখে কণ্ঠে।

৪৯

পানী মাহৈঁ রাখিযে
কনক কলংক ন জাই।
দাদূ গুরুকে জ্ঞান সোঁ
তাই অগিনিমেঁ বাহি ॥

জলের মধ্যে রাখিলে যায় না কনকের কলঙ্ক, হে দাদূ, গুরুর জ্ঞানদ্বারা তাহাকে অগ্নিতে কর দগ্ধ।

---

* ব্রহ্ম অখণ্ডাত্মাকে নানা আকারে পরিণত করিয়া, অখণ্ড বিশ্বকে সীমাবদ্ধ করিয়া, একটী প্রয়াস সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রহ্ম পূর্ণানন্দভরে রস সম্ভোগ করিতে চাহেন, অথচ অসীমতায় ও অনন্তের মধ্যে নাই কোন রস। তাই তিনি আকার ও সীমার মধ্যে বেদনা বেগ গতি ও নিপীড়ন সঞ্চার করিয়া, অসীম সিন্ধুর অন্তর হইতে অমৃত মহারস মন্থন করিয়া লইতেছেন। ঘানিতে যেমন গতি বেগ ও নিপীড়ন থাকাতে অন্তর্নিহিত স্নেহ-রসটি নিসান্দিত হইয়া চলিয়াছে, তেমনি আকারে ও গতিতে একটি নিত্য অমৃত মন্থন চলিয়াছে। তাই গ্রহ-চন্দ্র-তারার গতি হইতে শুষ্কপত্রপতন পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ গতিই একবারে অমৃতের প্রবাহ ছুটাইয়া চলিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ও সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও আকার একেবারে অমৃতধারা অজস্র নির্ঝরিত করিয়া চলিয়াছে।

১ "আমির" মূলে একটি অখণ্ড "সত্তা বিরাজমান। সেই অসীম "সত্তার" উপরেই "আমি প্রতিষ্ঠিত। "অহম্' ও সেই সত্তার মধ্যে একটি সজাতীয়ত্ব আছে। সেই সত্তা এই অহমেরই বিরাট স্বরূপ।

২ সকল "আকার" ও "বস্তুর মূলেই এক মহাবস্তু আছে। ব্রহ্ম যদি "বস্তু" না হইতেন তবে বস্তুর মূল কোথায়? "ব্রহ্মবস্তু" হইতেই সকল খণ্ড বস্তু তরঙ্গিয়া উঠিতেছে। সকল লহরীর মূলে যেমন একটি স্তব্ধ সমুদ্র বিদ্যমান তেমনি সকল তরঙ্গায়মান আকার ও বস্তুর মূলে এক স্তব্ধ গভীর মহাআকার ও মহাবস্তু বিরাজ-মান। বস্তু ও ব্রহ্মবস্তু সজাতীয়।

৩ "জীবনের" মূলে একটি "মহাজীবন" আছে। সেই এক ব্রহ্মজীবন হইতে সকল জীবন তরঙ্গিয়া উঠিতেছে। উভয় জীবনই এক জাতীয়, ইহারা উভয়েই অহমের এপিঠ আর ওপিঠ।

৪ এই যে জ্ঞান ইহা কৃত্রিম বা উৎপন্ন জ্ঞান নহে। নিশ্বাস যেমন গভীর জীবনের প্রতিক্ষণের উচ্ছ্বাস ও চিরন্তন জীবনের প্রতিক্ষণের সাক্ষী, এই জ্ঞানও তেমনি মহা গুরুর মহাজীবনজ্ঞানের একটি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও নিত্যসাক্ষ্য।

৫০

তৌ দাদূ ক্যা কীজিয়ে
বুরী বিথা মনমাহিঁ ॥

কি করিবি তবে দাদূ, নীচতার ব্যথা যে মনের মধ্যে।

৫১

তূঁ মেরা হৈ হউ তেরা
গুরু সিখ কীয়া মংত ॥
(ছঃ ১০)

তুমি আছ আমার, আমি আছি তোমার, গুরু শিষ্যে (পরিপূর্ণ) করা গেল এই মন্ত্র।

৫২

দাদূ সাচা গুরু মিলই
সনমুখ সিরজনহার ॥

হে দাদূ, সাচ্চা গুরু যদি মেলেন, তবে সম্মুখেই সৃজনকর্ত্তা।

৫৩

আপ সবারথ সব সগে
প্রাণ সনেহী নাহিঁ ॥

আপন স্বার্থে সবাই হয় আপন, নাই প্রাণের প্রেমিক।

৫৪

সুখকা সাথী জগৎ সব
দুঃখ কা নাহীঁ কোই।
দুঃখকা সাথী সাইঁয়া
দাদূ সত গুরু হোয় ॥

সুখের সাথী জগৎ, দুঃখের সাথী নাই কেহ। হে দাদূ দুঃখের সাথী স্বামী, তিনিই সত্য গুরু।

৫৫

দাদূকে দুজা নহীঁ
এঁকৈ আত্মারাম ॥

দাদূর দ্বিতীয় কেহ নাই, একই আত্মা ও রাম।

৫৬

সূরজ সম্মুখ আরসী
পাবক কিয়া প্রকাস ॥
দাদূ সাঈঁ সাধুবিচি
সহজহি উপজই দাস।

সূর্য্য (তাঁহার) সম্মুখস্থ দর্পণ, পাবক করিল (তাঁহাকে) প্রকাশ। হে দাদূ, (আমার) স্বামী সাধুর মধ্যে সহজেই দাসরূপে (আপনাকে) করিতেছেন উৎপন্ন। *

৫৭

বৈদ বিচারা ক্যা করই
রোগী রহই ন সাচ ॥

বৈদ্য বেচারা করিবে কি, রোগীই রহিল না সাচ্চা।

৫৮

হে দাদূ অবিচল মংত্র অখয় মংত্র অভয় মংত্র রাম মংত্র নিজসার।

সজীবনিমংত্র সবীরজ মংত্র সুন্দর মংত্র শিরোমনি মংত্র নির্ম্মল মংত্র নিরাকার ॥

অ১থ মংত্র অকল মংত্র অগাধ মংত্র অপার মন্ত্র অনংত মংত্র রায়া।

নূর মংত্র তেজ মংত্র জ্যোতি মংত্র প্রকাশ মংত্র পরম মংত্র পায়া ॥

উপদেশ দিখায়া ॥

হে দাদূ, অবিচল মন্ত্র, অক্ষয় মন্ত্র, অভয় মন্ত্র, প্রেম (রাম) মন্ত্র—নিজের সার। সঞ্জীবনী মন্ত্র, সবীর্য্য মন্ত্র, সুন্দর মন্ত্র, শিরোমণি মন্ত্র, নির্ম্মল মন্ত্র—নিরাকার। অলক্ষ্য মন্ত্র, অখণ্ড মন্ত্র, অগাধ মন্ত্র, অপার মন্ত্র, অনন্ত মন্ত্র—বিরাজিত।

দীপ্তি মন্ত্র, তেজ মন্ত্র, জ্যোতি মন্ত্র, প্রকাশ মন্ত্র, পরম মন্ত্র পাইলাম।

উপদেশ (যে লাভ করিয়াছি তাহা) দেখাইয়া দিলাম (জীবনে)।

৫৯

দাদূ সবহী গুরু কিয়া
পশু পংখী বনরাই।
পংচ তত্ত্ব গুন তিনি মেঁ
সবহী মাহি খুদাই ॥

হে দাদূ, সকলই করিয়াছেন গুরু—পশু, পক্ষী, বন-

* সেই নিরঞ্জনের কল্যাণরূপ নানা ভাবের সেবায় জগতে দেখা দিয়াছে। সেই "শিবম্" আপনার সেবা সূর্য্যের মধ্যে অগ্নির মধ্যে প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছেন। যেখানে তিনি "শিবম্" সেখানে তিনি দাস হইয়া বিশ্বকে সেবা করেন। সূর্য্য যথাকালে প্রতিনিয়ত সর্ব্ববিধ সেবা করে। অগ্নি সর্ব্বত্র আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া যথার্থ ভৃত্যের মত সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকে ও প্রয়োজন হইলে প্রবল শক্তিতে সেবা করে।

অগ্নি ও সূর্য্য তাঁহার যথার্থ সেবক "শিবরূপকেই" প্রকাশ করে। সাধুর অন্তরেও তেমনি 'শিবম' দাস হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন। তাই সাধক সদা জাগ্রত, সদা দীপ্ত, সদা প্রচ্ছন্ন, সদা সক্ষম সেবক। সাধকের সেবাটি তাঁহারই "শিবম্" রূপের দর্পণ।

অগ্নি ও সূর্য্য যেমন আপনার জন্য সকল জ্বালা রাখিয়া সংসারে দেন। জ্যোতি ও প্রাণ, "শিবম" তেমনি সকল সংসারে অমৃত বিতরণ করিয়া আপনি রাখেন জ্বালা। পরে এরূপ ভাব আরও পাওয়া যাইবে।

রাজী। পঞ্চ তত্ত্ব ও তিন গুণের মধ্যে এবং সকলের মধ্যেই যে পরমাত্মাই (অধিষ্ঠিত) *

৬০

জে পহলী সত গুরু কহা
মৈনসুঁ দেখা আই।
অরস পরস মিলি এক রস
দাদূ রহে সমাই॥

সদ্ গুরুর যাহা আদি বাণী, নয়নেও তাহাই আসিয়া দেখিলাম।

অরস পরস † মিলিয়া এক রস, দাদূ রহিল তাহাতে সমাহিত।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

THE ATTITUDE OF THE ADI BRAHMA SAMAJ IN REGARD TO THE PROPOSED AMENDMENT OF ACT III OF 1872.

Being a reply sent on behalf of the Adi Brahma Samaj to the Government Circular asking for an expression of its Views on the proposed Special Marriage Bill.

I. Neither the provisions of the original Act, nor of its amendment, directly touch us, the members of the Adi Brahma Samaj, in asmuch as we have not departed in any essential particular from Hindu usage or custom, and, in the matter of the marriage ceremonial, follow the Vedic ritual, which, we are advised, conforms sufficiently to the present orthodox practice to be legally valid by itself, to say nothing of the sanction it has by this time acquired as an unbroken custom.

2. For the reasons above indicated, however, we think we may fairly claim to represent advanced Hindu feeling or at least a considerable section thereof; and such feeling was, and still is, opposed to the sections of the original Act now proposed to be amended, as tending to weaken and otherwise harm, the Hindu community as a whole; and therefore welcomes with a corresponding sense of relief the proposed amendments as removing all the objectionable features of this otherwise beneficial statute.

3. This weakening and harmful tendency which we apprehend, and to some extent have actually observed, is a twofold one.

Firstly, there is the elimination of those individuals whose sensitiveness of conscience and strength of character do not permit of their conforming to orthodox practice in all particulars, though they hold the same beliefs, reverence the same ideals and in general live the same type of social life as their more conservative brethren; thus depriving the Hindu community not only of desirable, but occasionally of most valuable members.

Secondly, there is the temptation for those of weaker moral fibre, who for any reason do not find full satisfaction in and through orthodox conditions, to enter, more or less clandestinely, into illegal connectons, which cannot but have a pernicious and disruptive effect on the whole community in the long run.

4. We are aware that the less advanced sections of the Hindu community are strongly opposed to the proposed amendment; but surmise that, where such opposition does not proceed from blind prejudice pure and simple, it is based on the misapprehension that legislation of a permissive, and not obligatory, character is calculated either to make or mar a social system. Had the Hindu community come to such a pass that it was only waiting for some sort of legal sanction to subvert and violate its established and cherished customs and traditions, then the mere absence of such sanction could not have long delayed that undesirable consummation.

5. We of the advanced section have a more robust faith in the inherent soundness of the essentials of our Religious and Social

---

* গুরুই সব বিশ্ব রচনা করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত আছেন। অথবা সমস্ত বিশ্বকে তিনি গুরু করিয়া দিয়াছেন, কারণ সর্ব্বত্র তিনিই সমাহিত আছেন। তিনি পশু পক্ষী বনরাজী পঞ্চতত্ত্ব ও তিন গুণ ও সমস্ত জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমশঃ আমার চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া আমাকে তিনি দীক্ষা দিয়াছেন।

এই দুই প্রকার অর্থই হয়।

† পূর্ব্বে দেখ।

system ; and therefore welcome any assistance, from within or without, which may help us to shake off effete and meaningless habits and customs which tend to retard that progressive adaptation to changing circumstances without which no institution can hope to survive ; relying on the very access of vitality, which we thereby hope to gain, as the best means of preserving and keeping pure the invaluable ideals, culture and art of life of which we are the inheritors and custodians.

6. In conclusion I beg, on behalf of the section of the Hindu community to whose sentiments I am giving expression, to convey our unqualified approval and entire support of the proposed amendments to Act. III of 1872 ; and would respectfully impress upon Government the desirability of not being led to deviate from its consistent policy of allowing the fullest liberty of conscience and conduct by attaching too much weight to any merely fanatic or sectarian clamour.

SATYENDRA NATH TAGORE.
Minister, ADI BRAHMO SAMAJ.
Jorasanko, Calcutta.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৬২॥৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০৫৬॥ ৬
সমষ্টি	...	৮৪১৯৶
ব্যয়	...	৭৫২৮৸৵৯
স্থিত	...	৮৯০।৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৯০।৩

৮৯০।৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪০৩৯৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২২৭।৴০
পুস্তকালয়		১৪০॥৶৯
যন্ত্রালয়	...	৮৬৮॥৶৬
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৭৬৲
ইলেকৃট্রিক্ লাইট	...	১০৲
সমষ্টি	...	৫৩৬২॥৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬১২০॥৴৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৬০।৵৩
পুস্তকালয়	...	৮৬।৴৩
যন্ত্রালয়	...	৯৪৬৵৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১৫।৶৬
সমষ্টি		৭৫২৮৸৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্ব.কার।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৩৸০
„ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	যশোহর	৪৲
„ সুশীলকুমার ঘোষ	বর্ম্মা	৫৲

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	কুমিল্লা	৩৷৹
„ হরকুমার সরকার	ঘোড়ামারা	৯৷/৹
„ সতীনাথ রায়	কলিকাতা	২৲
„ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ হৃদয়নাথ আচার্য্য	কাউরেড্	৩৶৹
„ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩৶৹
সম্পাদক হরিসেনা মণ্ডলী	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	কুচবেহার	৩৲
„ গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	ভাগলপুর	৩৷৶৹
„ রজনীমোহন রায়	কাকিনা	৯৸৶৹
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	৬৸৹
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী	কলিকাতা	১৷৶
সম্পাদক হেমচন্দ্র লাইব্রেরী	ক্ষিদিরপুর	১৷৶
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	৩৲
„ তুলসীদাস দত্ত	কালিঘাট	৩৶৹
„ পঞ্চানন মিশ্র	তোটানালা	২৲
„ ভূজেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	১৷৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	১৵৹
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৩৶৹
„ বিনোদবিহারি সেন	বর্দ্ধমান	৷৶৹
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র দাস	কলিকাতা	২৶৹
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	৩৲
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১২৲
„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত	„	১৷৶
„ শিশিরকুমার দত্ত	„	১৷৶৹
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	„	৩৲
		১০৬৶৹

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
„ শরৎচন্দ্র চৌধুরী	১৲
„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১৲
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	১০৲
„ সৌদামিনী দেবী	২৲
„ অলোকা দেবী	২৲
„ ইরাবতী দেবী	১৲
„ ললিতা দেবী	১৲
„ সরোজিনী দেবী	১৲
„ সুহাসিনী দেবী	১৲
শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	১৷৹

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীবিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীতুলসীদাস দত্ত	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১০৲
„ বসন্তকুমারী সেনগুপ্তা	৬৲
„ সরলাবালা দাস গুপ্তা	২৲

এককালীন দান।

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৬৭/৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় শনিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊন-ষষ্ঠীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

প্রথম ভাগ।

আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৫ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদান্তবাদ।

প্রথম প্রপাঠক।

পরিচয়।

২।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রধান উপনিষৎ গুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। অধিকাংশত বলিবার কারণ এই যে, এরূপও প্রধান উপনিষৎ আছে, যাহা ব্রাহ্মণের মধ্যে নহে। ঈশোপনিষৎ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত নহে ইহা মন্ত্রের অন্তর্গত, শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার চত্বারিংশ অধ্যায়ই ঈশোপনিষৎ। ঐ সংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী ঊনচত্বারিংশটি অধ্যায়ে কর্ম্ম আলোচিত হওয়ায় তাহা কর্ম্মকাণ্ড, এবং শেষ অধ্যায়টিতে জ্ঞান আলোচিত হওয়ায়, তাহা জ্ঞান কাণ্ড। কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত বেদের এখানে অন্ত বা শেষ কাণ্ডই ঐ উপনিষৎখানা হওয়ায় তাহার বেদান্ত নাম গ্রহণে কোন বাধা নাই।

আবার এইরূপও উপনিষৎ আছে, যাহা মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ কাহারই মধ্যে নহে; যেমন গর্ভোপনিষৎ। এই জাতীয় উপনিষদের অস্তিত্ব না মন্ত্র না ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। তথাপি এই সমুদয় গ্রন্থ উপনিষৎ-নামে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—পূর্ব্বে এরূপ একটি সময় আসিয়াছিল, যখন উপনিষদের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়পূর্ণ কোন গ্রন্থ রচিত হইলেই তাহা উপনিষদের ন্যায় বলিয়া উপনিষৎ-নামে প্রসিদ্ধ হইত। পাণিনির একটি সূত্রেও আমরা ইহার পরিচয় পাই যে, উপনিষদের ন্যায় গ্রন্থও উপনিষৎ বলিয়া খ্যাত হইত।* সময়ে সময়ে সমস্ত সাহিত্যেই এক এক জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। উপনিষদের অনুকরণে যেরূপ উপনিষৎ রচিত হইত, ব্রাহ্মণের অনুকরণেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, এই সকল ব্রাহ্মণ অনুব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। উপবেদের নাম প্রচলিত আছে। পুরাণের অনুকরণে উপপুরাণের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে হংসদূত, পদাঙ্কদূত ইত্যাদির রচনাও বিদ্বৎসমাজে অবিদিত নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহু উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। কাল্যুপনিষৎ,* তারোপনিষৎ, গোপালতাপন্যুপনিষৎ ইত্যাদি নামে পরবর্ত্তী কালে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, মহম্মদীয় ধর্ম্মমত লইয়াও উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। এই উপনিষৎখানির নাম অল্লোপনিষৎ। ইহা কয়েক পঙ্ক্তি মাত্র। আদর্শ স্বরূপ তাহার শেষটুকু উদাহৃত হইতেছে:

"অল্লো পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপং দিব্যানি ধত্তে, ইন্দ্রো বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ। ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপা আথর্ব্বণী শাখা। হুঁ হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্। অসুর সংহারিণীং হুঁ অল্লো রসুলমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ।"

এতৎ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না, এই

* "জীবিকোপনিষদা বৌপম্যে"—পাণিনি, ১.৪ ৭৯; ইহার একটি উদাহরণ "উপনিষৎ কৃত্য," বৈয়াকরণিকগণ ইহার অর্থ করিবেন—'উপনিষৎ গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ করিয়া।'

উপনিষৎখানি কিরূপ তাহা এইটুকু দেখিলেই স্পষ্ট জানা যাইবে। উপনিষৎখানির শেষে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ মন্ত্র "আর্থর্ব্বণ সূক্ত," অর্থাৎ অথর্ববেদের সূক্ত।

এই জাতীয় উপনিষৎকে লইয়াই উপনিষদের সংখ্যা, শুনিয়াছি, দুই শতেরও উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ একশত আটখানি উপনিষদের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং তৎসমুদয় মুদ্রিতও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপনিষৎ সুপ্রসিদ্ধ ও প্রধান, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকি উপনিষদও উপাদেয় ও অতি প্রামাণিক। এতদ্ভিন্ন আ থ র্ব্ব ণ (অর্থাৎ অথর্ব্ব বেদীয়) বলিয়া প্রচলিত অথর্ব্বশিখা হইতে হংস পর্য্যন্ত বত্রিশ খানি উপনিষৎ পূর্ব্বোক্তগুলির সঙ্গে কোন গুণেই সমান না হইলেও ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক ভাল কথা আছে, এবং সেই সকল কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। অনেক স্থানে সংক্ষেপে সার কথাও ইহাদের মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। প্রধান প্রধান আচার্য্যগণও সময়ে সময়ে এই সকল উপনিষদের মধ্যে কোন কোন খানির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অবশিষ্ট উপনিষদ্ গুলির মধ্যেও স্থানে স্থানে উপাদেয় বাক্যাবলী দেখা যায়, এবং অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্বও আছে। এই জন্য ঐতিহাসিকের এ গুলিও একেবারে পরিত্যাজ্য নহে।

পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন মুখ্য উপনিষদ্ গুলি সমস্তই যে একজন ঋষির দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, এবং এক এক খানি উপনিষদেরও সমগ্র অংশ যে একজনেরই দৃষ্ট তাহাও বলা যায় না। যেমন ঋগ্বেদে বিভিন্ন বিভিন্ন ঋষির সূক্ত সমূহ একত্র সমাগত হইয়াছে, এই উপনিষদ্ গুলিও সেইরূপ হইতে পারে, কোনো কোনো খানি বা একজনেরও হইতে পারে। এই জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিভিন্ন কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কোনো স্থানে একটি মত খণ্ডন করিয়া আর একটি মত স্থাপিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬২-১২) শ্বেতুকেতু ও আরুণির সংবাদ উল্লেখ করিতে পারা যায়। আরুণি বলিতেছেন— "হে সোম্য, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল; কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় অসৎই ছিল, এবং অসৎ হইতে সৎ জাত হইয়াছে।" আরুণি এই বলিয়া শ্বেতকেতুকে পুনবার বলিতেছেন— "কিন্তু হে সোম্য, কি প্রকারে ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জাত হইয়াছিল? হে সোম্য, অগ্রে একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল।" এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, আরুণি অসদ্বাদ খণ্ডন করিয়া সদ্বাদ স্থাপন করিতেছেন। এরূপ অন্য দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আবার উপনিষৎ সমূহের স্থানে স্থানে এরূপ গম্ভীর বা জটিল কথা আছে, যাহার সারতত্ত্ব সহজে বুঝা যায় না; অথবা একজন একরূপ ও অপর জন আর একরূপ বুঝেন। কেহ কোনো উপনিষদের এক কথা দেখিয়া তাহাই একমাত্র সত্য মনে করেন, এবং অপর উপনিষদে তৎসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। স্বয়ং উপনিষদের ঋষিগণের যে শক্তি বা স্বাধীনতা ছিল, তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকগণের সেরূপ শক্তি বা স্বাধীনতা ছিল না। পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বাধীনভাবে স্বশক্তি প্রভাবে যাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন, তাহাই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে উপনিষদে স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে অপর ঋষির মতের সহিত বিরোধ হইলেও তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী জনগণের তাদৃশ শক্তি ছিল না, ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন, এবং ঐ অনুসরণ করিতে গিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সকলকেই সমান ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেননা, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পরস্পরের মধ্যে একের অন্যাপেক্ষায় লঘুত্ব বা গুরুত্ব বা প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য নির্ণয় করিতে তাঁহারা পারেন না। এই জন্য পরবর্ত্তিগণকে সমস্ত উপনিষৎকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে মতদ্বৈধের নিবৃত্তি হইল না। কথায় সমস্ত উপনিষৎকে প্রমাণ স্বীকার করিলেও কাজে অনেক বাধা উপস্থিত হইল, কেননা, বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ মত রহিয়াছে অথবা প্রতীয়মান হইতেছে। এই বাধার নিষ্পত্তির জন্যই তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত উপনিষদের মধ্যে একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। যদিও বস্তুত উপনিষদে স্থানে স্থানে ভিন্ন মতই রহিয়াছে, তথাপি তাঁহারা সমগ্র উপনিষদের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য ঐ ভিন্ন ভিন্ন মতকেই সমন্বয় করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা তজ্জন্য সমস্ত উপনিষৎ লইয়াই মীমাংসা বা বিচার করিতে লাগিলেন, এবং সেই মীমাংসা বা বিচারের ফলই উ ত্ত র মী মাং সা র আকার ধারণ করিয়াছে।

কর্ম্ম সম্বন্ধেও মতদ্বৈধাদিনিবারণের জন্য যখন কর্ম্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবচন গুলির মীমাংসার প্রয়োজন হয়, তখন তাহারই ফল স্বরূপ পূর্ব্ব মী মাং সা র উৎপত্তি হয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই ভাগের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই কর্ম্মমীমাংসাকে পূ র্ব্ব মী মাং সা, এবং জ্ঞানকাণ্ড তাহার উ ত্ত র বা পরবর্ত্তী হওয়ায় তাহার নাম উ ত্ত র মী মাং সা হইয়াছে। পূর্ব্ব মীমাংসার

প্রণেতার নাম জৈমিনি, এবং উত্তরমীমাংসার প্রণেতার নাম ব্যাস বা বাদরায়ণ। এই জন্য তাঁহাদের নামে যথাক্রমে পূর্ব্বমীমাংসাকে জৈমিনিসূত্র, এবং উত্তর মীমাংসাকে ব্যাসসূত্র নামে উল্লেখ করা হয়। পূর্ব্বমীমাংসায় কর্ম্মকাণ্ড বিচারিত হওয়ায় তাহাকে কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা যায়। এইরূপ উত্তর মীমাংসায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্র নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্বসমূহ ইহাতে সূত্ররূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম বেদান্তসূত্র।

বেদান্তসূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং এই প্রত্যেক অধ্যায়েরই এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে, এবং নামগুলি সেই সেই অধ্যায়ের প্রতিপাদিত বিষয়গুলি সূচিত করিয়া দেয়। ঐ নাম কয়েকটি যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন, ও ফল। সমন্বয়নামক প্রথমাধ্যায়ে বিবিধ শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অবিরোধ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্ত সমন্বয়ে নানাবিধ মত ও শ্রুতির বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে, সাধন নামক তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন বর্ণিত হইয়াছে, এবং শেষ ফল-নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তি প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এক-একটি অধ্যায় আবার চারি চারি অংশে বিভক্ত, এই অংশ সমুদয়কে পাদ বলা হয়। আবার প্রত্যেক অধ্যায়েই কতকগুলি করিয়া অধিকরণ অর্থাৎ প্রকরণবিশেষ আছে। সমগ্র গ্রন্থে মোট ১৯২টি অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণই কতকগুলি সূত্র লইয়া রচিত। অভিজ্ঞগণ অধিকরণের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক অধিকরণেই এই কয়টি অংশ থাকিবে;— যথা, বিষয়, অর্থাৎ বিচার্য্য বস্তু, যাহার বিচার করিতে হইবে; সংশয়, অর্থাৎ সেই বিষয়টি কি জন্য বিচার্য্য, তাহাতে কোন সংশয় আছে কি না, যদি না থাকে, তবে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন থাকে না, অতএব তাহাতে কি সংশয় আছে, তাহা অবশ্য প্রদর্শনীয়; পূর্ব্বপক্ষ, অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিরোধী তর্কের উপস্থাপন, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনে তর্ক; উত্তর, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তের স্থাপন; এবং নির্ণয়, বিচার্য্য বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রদর্শন।

উপনিষৎ সমূহের তত্ত্ববিচারের জন্য ব্রহ্মসূত্রই একমাত্র গ্রন্থ; ব্রহ্মসূত্রেই উপনিষদ্ বাক্যসমূহ ন্যায়ানুসারে বিচারিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে এরূপ অপর কোনো গ্রন্থের নাম এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার পর হইতে বেদান্ততত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই তাহা আদর করিতেন, এবং সকলেই তাহার নির্ব্বিবাদ প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। খুব সম্ভব এই কারণেই ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় অপর কোন তজ্জাতীয় গ্রন্থের তখন কোন আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

কিন্তু যদিও সেইরূপ অপর গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এবং সকলেই তাহাকে পরবর্ত্তী কালে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি মনীষিগণের নব নব চিন্তা প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা স্ব স্ব বিভিন্ন বিভিন্ন চিন্তা-প্রভাবে ঐ বেদান্ত সূত্রেরই বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ দেখিতে পাইলেন, এবং তদনুসারে তাহার ব্যাখ্যাও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অতি প্রাচীন কালের এইরূপ তিন খানি ব্যাখ্যার কথা আমরা জানিতে পারি, যদিও বর্ত্তমান সময়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য স্ব স্ব ভাষ্যে (যথাক্রমে বে· দ· ৩· ৩·৫৩, ও ১· ১· ১) উপবর্ষের রচিত বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। পাণিনির গুরুর নাম উপবর্ষ ছিল, তিনিই ঐ বৃত্তির রচয়িতা হইতে পারেন।১ রামানুজ স্বকীয় ভাষ্যে (বে· দ· ১· ১· ১) বৌধায়নের বৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাঁহার বেদান্ত দর্শনের শ্রীভাষ্য এই বৌধায়নকৃত বৃত্তি অনুসরণেই রচিত। আর এক খানি বৃত্তি ঔডুলোমি-বিরচিত।* বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত নিম্বার্কদর্শনের মুখপত্রে লিখিত আছে যে, নিম্বার্কের বেদান্ত দর্শনব্যাখ্যা ঔডুলোমি-কৃত বৃত্তির অনুসরণেই রচিত হইয়াছে। যে ব্যাখ্যা সংক্ষেপে সূত্রের অর্থটুকু প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাকে বৃত্তি বলে।

এই তিন প্রাচীন বৃত্তির পর ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের পূর্ব্বে, এই মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে বেদান্ত সূত্রের আর কোনো ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমি জানি না। ইহার পরেই শঙ্করাচার্য্যের আগমন। ইঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রপাঠকে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

১ শাঙ্কর ভাষ্য "অতএব ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধান প্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।" ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপবর্ষ পূর্ব্বমীমাংসারও বৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাস্কর ভাষ্যে "অতএব উপবর্ষাচার্য্যেণ উক্তং প্রথম পাদ (কর্ম্ম মীমাংসায়াঃ) আত্মবাদং তু শারীরকে বক্ষ্যাম ইতি।"

* ঔডুলোমির মতবিশেষ তাঁহার নামেই বেদান্ত সূত্রে (৪· ৪·) উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুন্দর।*

পশ্চিম আকাশের পারে তখনো সূর্য্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যা-বেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুল্‌ছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল; যেদিন প্রত্যহ সূর্য্যের উদয় এদেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখীর কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুল্‌ত; এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আন্‌ত ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্য্যাবর্ত্তের দিগন্ত-প্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্য্য-পিতামহেরা তাকে একদিনও একবেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেবল ভোগীর মত নয়, ভাবুকের মত নয়। সৌন্দর্য্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন—সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে ঊষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল নদীসঙ্গমে সমুদ্রতীরে পর্ব্বত-শিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান্‌রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠ্‌ছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোট না করে, ভক্তি-বৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জান্‌তে পারি। অর্থাৎ কেবলি তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান্ বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত সৌখীন রকম করে দেখ্‌তে চাই—তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই এই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোট করে দেখ্‌তে গেলে তার মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়র মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখ্‌তে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠিনে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোটকে আমরা বড় করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারিনে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এই জন্যে এই বিশাল সন্ধ্যা-কাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখ্‌তে পাচ্চি মানব-সংসারে তেমন সহজে দেখ্‌তে পাইনে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্ত্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখচি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করত যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনি অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইচে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তাহলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত হয়ে যেতুম। টুক্‌রো টুক্‌রো করে যদি দেখ তাহলে এর মধ্যে কত ঘাত সংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই যে আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঐ গাছটি এই তারা-খচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ'কে যদি আংশিক ভাবে দেখ্‌তে যাই তাহলে

*১৫ই চৈত্র বুধবারে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

দেখ্তে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে! আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখ্তে পাচ্চি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই, কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু ব্যর্থ যা কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করচে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডীকাটা জিনিষ নয় বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্চেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্চেন এত বড় বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করচে। সেই শক্তিকে দেখ্তে পাই সে অতি ভীষণ, সে কাট্‌চে ভাঙচে টান্‌চে জুড়চে, সে তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্য নিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে, তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে রোদসী রোদন করে উঠ্‌চে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখ্‌লে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অখণ্ড সত্যরূপ কি পরম শান্তিময় সুন্দর! সেই ভীষণ যদি সর্ব্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য্য থাক্‌ত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলি বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্যে থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলচে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ঙ্কর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য্য। জগতে এই মুহূর্ত্তেই যেমন আকাশজোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্ত্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্চে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্চেন—তাঁর ভয়ঙ্কর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলচে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্চে এখনি এ আমরা কত সহজে কি অনায়াসেই দেখ্‌তে পাচ্চি—আমাদের মনে ভয় নেই ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানব সংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করচে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ঙ্কর ঘাত সংঘাত সর্ব্বদাই বহন করে প্রত্যক্ষ করচি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য হানাহানি কাটাকাটির মন্থন কেবলি চারদিকে চল্‌চে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাক্‌ত তাহলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তনহীন কদর্য্যতার পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চল্‌চে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ত-তেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্য্যবেগে উদ্গত হয়ে উঠ্‌চে; তারই ভয়ঙ্কর পেষণে ঘর্ষণে রাজ্য সাম্রাজ্য শিল্প সাহিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষলাভ করে জেগে উঠ্‌চে। এই সংসারের মাঝখানে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহা সৌন্দর্য্যকেই দেখেন—তাঁরা অমৃতকেই দেখেন—য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমন ভাবে বলেন, যেন, প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন, যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে যেন উপরে ওঠবার কোন বেগ নেই; সেই জন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা ত প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখ্‌তে পাচ্চি—সে ত জড়যন্ত্রের মত একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করচে না। এ পর্য্যন্ত তাকে ত তার পথের কোনো একটা জায়গায় থেমে থাক্‌তে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প-সংঘাত থেকে চল্‌তে চল্‌তে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে; এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড়, কত প্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌চে; আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘন মেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে; যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখী, কত আশ্চর্য্য জন্তু কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্দ্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে

অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে ত যায় নি। থেমে যদি যেত তাহলে এখনি যা কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদিঅন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌ত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলি তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্ত্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারচে। কেবলি তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগতে হচ্চে, কেবলি তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্চে। এই জন্যেই এত দুঃখ এত মৃত্যু। কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্চে না, কেবলি ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা এক সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়;—এই জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতি ভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্ত্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্চি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্চে সুন্দরকে দেখা—এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সবসময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্চে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সেই সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করচে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখ্‌চি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখ্‌চিনে, সেই জন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্চেন না, সেই জন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

কিন্তু মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখ্‌তে চাও? তাহলে নিজের স্বার্থপর ছয়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এস। মানবচরিতকে যেখানে বড় করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখ শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্চে—তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে! কি তার দীপ্তি, কি তার সৌন্দর্য্য, কি তার পবিত্রতা! কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখ! কি দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তাহলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ এ'কে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈসাকে দেখ! সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কি সুন্দর! শুধু তাই নয়; তাঁর চারদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সঙ্কীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্ত্তির উপকরণ;—পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখ্‌তে পাচ্চি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখ্‌তে পাই। কেননা সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখিনে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখ্‌ব, ভীষণকে সুন্দর বলে জান্‌ব, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি, তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে, অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড করে এক করে সুন্দর করে দেখ্‌ব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাক্‌ব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্য্যকে যখন আমাদের দুর্ব্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য্য ভূমাকে আঘাত করতে থাক্‌বে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে—সেই সৌন্দর্য্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবেনা। তাই বলছিলুম সুন্দরকে

জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সেত মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনি সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্ম্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুফী কবি।

সুফী কবিরাই সুফীধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ এবং পরিষ্কার রূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। খ্যাতনামা পারসিক কবিদিগের মধ্যে সনাই, শেখ্ ফরিদুদ্দিন অত্তর, মওলানা জলালুদ্দিন রুমি, জামি, ইত্যাদি অনেক কবিরই প্রায় সমস্ত কবিতাই সুফী ধর্ম্মমতের সরস ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। কবি হাফিজ, "লিসানু-উল-গইয়ব"। অর্থাৎ 'অদৃশ্য জগতের জিহ্বা' এই উপাধি পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুফীধর্ম্মের দুইটি দিক আছে, তত্ত্বজ্ঞানের দিক এবং গূঢ়ভাবুকতার দিক। প্রথম দিকটার হিসাবে ঈশ্বর বিশুদ্ধ আত্মা, শেষ দিকটার হিসাবে তিনি একমাত্র সুন্দর; এবং পার্থিব রূপে, চিন্তায়, এবং কর্ম্মে যা কিছু সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের অস্পষ্ট প্রতিবিম্বমাত্র। আমাদের সসীম মন অসীমের ধারণা করিতে পারে না; অসীম আত্মার কোন বিশেষ প্রকাশের উপলব্ধি আমরা কেবল রূপকচ্ছলেই বলিয়া থাকি। কেহ ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজা বলে; কেহ তাঁহার অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পিতা বলে; এবং অন্যান্য মরমীদিগের ন্যায় সুফীরাও তাঁহার সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার রূপে উপলব্ধি করিয়াছে। এই জন্য সুফী কবিদিগের বন্দনা গানের মধ্যে প্রেমিকের প্রণয়বিহ্বল ভাষা স্থান পাইয়াছে, এবং এই জন্যই তাহারা ঈশ্বরকে বন্ধু এবং প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করে। বাস্তবিক তিনিই পরিপূর্ণ সুন্দর এবং নিখিল জগৎ তাঁহারই দর্পণ স্বরূপ।

কিন্তু এই বহির্জগৎ কি দর্পণরূপে সেই সত্য সুন্দরকে কখনও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিয়াছে? না। সুফী ধর্ম্মের সারকথা এই যে 'ঈশ্বরই একমাত্র ছিলেন, তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না'। কালের গতি প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর অব্যক্ত রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। "আমি গুপ্তরত্ন ছিলাম; আমি আপনাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি করিলাম।" উপরি-উক্ত বচনের টীকা স্বরূপ এবং সুফী কবিদিগের অদ্ভুত উপমার উদাহরণ স্বরূপ আমি জামি'র রচিত 'ইউসুফ্-উ-জুলেইখা'' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শুধু এক ছিল আগে; আমি-তুমি ভাবের অতীত,
পরম সুন্দর-শ্রেষ্ঠ সেই এক, দ্বিত্ব-বিবর্জ্জিত।
প্রকাশিত আপনার আলোকেতে আপন নিলয়ে,
অদৃশ্যের মাঝে লীন, সুপবিত্র সার বস্তু হয়ে,
পাপ পরিশূন্য রূপে। ছিল না দর্পণ, মাধুরীর
প্রতিবিম্ব আরোপিতে; চিকুর বিন্যাসে চিরুণীর
ছিলনাক প্রয়োজন; প্রভাতের সমীর চঞ্চল
দোলায়নি কেশগুচ্ছ; দু'নয়নে দেয়নি কাজল
উজ্জলিতে আঁখিতারা; শোভে নাই কিংশুক রঙীন
কপোল কুন্তল তলে; হয় নি সে কারো সম্মুখীন,
নয়ন দেখেনি তারে। শুনিতে কেবলি নিজ কানে
বাক্যহীন ছন্দোবন্ধে আনন্দ বাজিত তার গানে।
কিন্তু যা সুন্দর সে ত কভু নাহি রহিবে গোপনে,
ভক্তের বন্দনাহীন অদৃশ্য সে থাকিবে কেমনে!
টুটিয়া সকল বন্ধ, নিজ অন্ধ কারাগার হ'তে
আপনা প্রকাশ সে যে করিবেই এ বিশ্ব জগতে!
বসন্ত সুরভি-শ্বাসে হের ঐ যত বন ফুল
পরে কি মোহন বেশ! কণ্টকের মাঝারে অতুল
গোলাপ সে বক্ষ হতে বসন ছিঁড়িয়া দিল খুলি
আপনার মধুরিমা আলোকের পানে দিল তুলি।
তেমনি জানিতে হবে সুদুর্লভ ভাব এলে মনে,
অথবা সৌন্দর্য্য মোহ কিংবা গূঢ় রহস্য গোপনে
হৃদয়ে জাগিলে তারে তুমিও ছাড়িয়া নাহি দাও,
আঁকড়ি ধরিয়া রাখ; কথা কিম্বা রচনাতে চাও
প্রকাশ করিতে তাহা। জগতের মন মোহিবারে
আপনা প্রকাশ সে যে করিবে কে ধরে রাখে তারে?
সুন্দরের ইহাই স্বভাব; যেথানে সে থাকুক্ না কেন,
আপন আধার হতে মহৎ সে, ইহা ধ্রুব জেনো।
পবিত্র স্বরূপ হতে লভি জন্ম, জগতের পরে
সবার অন্তর মাঝে সে কিরণ পড়িতেছে ঝরে।
তাহার একটি রশ্মি বিশ্বমাঝে, দেবতার তরে
প্রেরণ করিল যবে, ধাঁধিল নয়ন ক্ষণপরে
দেবতার; ঘুরিল মস্তক যথা বিশ্ব ঘূর্ণ্যমান।
প্রত্যেক দর্পণ তাঁর দেখাইছে মুরতি নানান্;
সর্ব্বত্র বিচিত্র সুরে ধ্বনিতেছে তাঁরি জয়-গীতি।
মুগ্ধ স্বর্গশিশু তাঁর জয় গান গাহিতেছে নিতি।

* * * *

প্রতি অণু পরমাণু সকলি সে তাঁরি দরপণ;
তার মাঝে উঠে ফুটে তাঁহার সে মুরতি শোভন।

গোলাপ কুসুম হতে তাঁরি রূপ পড়ে ঠিকরিয়া,
তাই তারে হেরি হয় আত্মহারা বনের পাপিয়া।
বর্ত্তিকা লভিল সেই জ্যোতি হতে আলোটুকু তার,
তাই ত পতঙ্গ তারি মাঝে সঁপে দেহ আপনার।
সমুজ্জ্বল তপনের অন্তরেতে তাঁর দীপ্তি ভায়,
তাই ত কমল ঢেউ-টলমল মুখ তুলে চায়!
'লয়লী'র প্রতি কেশ মজনু হৃদয় নিল কাড়ি;
সে লাবণ্য ফুটেছিল তার মুখে, সে যে রূপ তাঁরি।
তাঁহার মাধুরী পূর্ণ রহিয়াছে হের বিশ্বময়,
পৃথিবীর রূপে তারই ঈষৎ পাইবে পরিচয়।
যেথা যত আবরণ, তার মাঝে রয়েছেন তিনি,
যে হৃদয় প্রেমে নত, তারে সেই লইয়াছে জিনি।
তাঁরি প্রেমে ধায় সবে তাঁহারেই লভিবার তরে।
মুকুর হইয়া ধর তাঁর রূপ তোমার ভিতরে।
তুমি গুপ্ত থাক, হোক্ একমাত্র তাঁহারি প্রকাশ;
তোমারে আচ্ছন্ন করি তাঁর প্রেম করুক বিলাস।
তিনিই পেটক, আর তিনি সুরক্ষিত ধন রত্ন;
'তুমি' 'আমি', যাহা কিছু আসে যায় সবই মিথ্যা স্বপ্ন!
ক্ষান্ত হও বাক্য মোর! এ কাহিনী এ যে অন্তহীন;
কেমনে মহিমা তাঁর বরণিবে বাক্য মোর ক্ষীণ!
সকলের চেয়ে ভাল নীরবে কেবল প্রেম সেবা,
অকাতরে দুঃখ বহি, ভাবি, তিনি সব, আমি কেবা!

সুফীধর্ম্ম সৃষ্টিরহস্যের কিরূপ মীমাংসা করে তাহা উল্লিখিত কবিতাটিতে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। আদিকালে এই বহু বিচিত্রের অস্তিত্বের পূর্ব্বে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা পরম সুন্দর পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বর, স্তব্ধ এবং আত্মগতরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে কেন উদয় হইল এ কথার উত্তর দেওয়া মানবজ্ঞানের সাধ্যাতীত। যাহা কিছু সুন্দর তাহাই আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল, এই উদাহরণের দ্বারা জামি এ রহস্য সম্বন্ধে নিজের মীমাংসাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সুন্দর সে যেমন আপনার রূপ সকলকে দেখাইবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকে, তেমনি কোন সুন্দর ভাব যদি কোন লোকের মনে উদয় হয় তবে সে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই প্রকাশ-বেদনা সেই পরমসুন্দরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আছে, কারণ এই প্রকাশবেদনাই সেই পূর্ণ এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যময় একের প্রধান গুণ। মানিয়া লইলাম প্রকাশ চাই-ই, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে? কোনো বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার বিপরীতস্বভাব বস্তুর সহিত তাহাকে পাশাপাশি বসাইতে হয়। যেমন অন্ধকার না থাকিলে আমরা আলোর ধারণা করিতে পারিতাম না। কিন্তু সুফীমতঅনুসারে 'অন্ধকার আছে' এই ধারণাটাই ভুল ধারণা। বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কোন জিনিষ নাই; অন্ধকার বলিলেই বুঝায় আলো নাই। এই মতটি মানিয়া লইয়া পুনর্ব্বার বলিতেছি, কোন বস্তুকে জানিতে হইলে তাহাকে তাহার বৈপরীত্যের মধ্যে দেখিতে হয়।

সুফীদিগের পাপের রহস্যের মীমাংসাটিও ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। ঈশ্বর আপনাকে জানাইতে চাহিলেন; তিনি অপাপবিদ্ধ, এই জন্য পাপ আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে জানা যায়। এই পাপের রহস্য এবং সৃষ্টির রহস্য দুইই বস্তুতঃ এক। সুফীরা কি তবে দ্বৈতবাদী? না। ঈশ্বর যখন একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ এবং একমাত্র সত্য, তখন পাপ শুধু যে অমঙ্গল তাহা নহে, একেবারে 'নাস্তি'। অন্য রূপে বলিতে গেলে পাপ বা অমঙ্গল প্রকাশ-চেষ্টাসংঘটিত একটি মায়া। বস্তুত তাহা অসত্য, এবং ক্ষণস্থায়ী। জলালুদ্দিনরূমি বলেন, "জগতে পরিপূর্ণ মিথ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ পাপের অস্তিত্ব আপেক্ষিক।"

এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে এই পরিদৃশ্যমান, জড় বা অচিরস্থায়ী জগৎ, যাহাতে আমরা বিচরণ করিতেছি, ইহা বস্তুটা কি? উহা আর কিছুই নহে কেবল 'নাস্তি'র উপর সেই 'অস্তি'র প্রতিবিম্ব; আকারহীন শূন্যতার মধ্য হইতে দৈবঘটিত একটি স্বপ্নরূপ; ঈশ্বরের সত্তাকে প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য মঙ্গল এবং অমঙ্গলের একটি সংঘাত। কেবলমাত্র পঞ্চভূতের সমষ্টি লইয়াই যে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব তাহা নহে, যিনি মনের মন ইহা তাঁহারই মনের একটি প্রকাশ। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি পরিষ্কার হইবে। আমরা ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা প্রকৃত সূর্য্য কিরূপ তাহার কতকটা আভাস পাই। কিন্তু কেবল সূর্য্যের কতকগুলি গুণের পরিচয় পাই, তাহার সার বস্তুটুকু পাই না। যে পরিমাণে উহা সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করে, সেই পরিমাণে উহা সত্য, এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে তাহার জন্য উহা সূর্য্যের নিকট ঋণী। এককথায় উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহার অস্তিত্ব সূর্য্যের প্রকাশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সূর্য্য আপনার তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেই উহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সূর্য্য কিন্তু উহার অধীন নহে, উহা না থাকিলেও সূর্য্যের কিছুই আসে যায় না, এবং নিজের তিলমাত্র ক্ষতি না করিয়াও সূর্য্য বারবার অনায়াসে নিজের প্রতিমূর্ত্তি ঐ জলাশয়ের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও ঐরূপ।

এখন এই অচিরস্থায়ী জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং

শিরোভূষণ মানবের স্থান কি তাহা দেখা যাউক। 'গুল-শানীরাজ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

এই 'নাস্তি' সে পরম পরিপূর্ণ 'অস্তির' মুকুর,
এর প্রতিবিম্বে তাঁর অপার মহিমা ভরপুর।
বিরোধ বাধিল যবে 'নাস্তি' আর 'অস্তি' দোঁহা সাথে,
তখনি এ প্রতিরূপ ফুটিয়া উঠিল আয়নাতে।
দু'য়ের মিলনে হল একের চূড়ান্ত পরকাশ;
এক, এক-ই, বারবার গুণিলেই একত্বের নাশ।
এই গণনার কালে একেতেই ভিত্তি আছে তার,
এক কিন্তু তবু দেখ কত! তারে গুণে ওঠা ভার।
'নাস্তি' দরপণ; বিশ্ব, প্রতিবিম্ব; মানব তাহাতে
প্রাণময় চক্ষুরূপ, সেই চক্ষে প্রতিবিম্ব তাতে।
তুমি সেই আঁখি, তার মাঝারে আলোকরূপ তাঁরি,
তোমারি নয়নে রহি মুগ্ধ তিনি আপনা নেহারি।
এ বিশ্বই মানব, মানব মাঝে বিশ্বচরাচর,
আর কি করিব ব্যাখ্যা ইহা হতে সরল সুন্দর?
এই রহস্যের গোড়া খুঁজে যবে পাইবে সন্ধান,
দেখিবে তিনিই দৃষ্টি, তিনি দ্রষ্টা, তিনি দৃ'নয়ান।

তাহা হইলে মানুষের দুঃখটা কি, এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভই বা হইবে কেমন করিয়া? এই দুঃখের কারণ আবিষ্কার করিলেই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই পরমাশান্তি লাভ হইবে, তত্ত্বজ্ঞানে এই কথা বলে। সেই দুঃখ আপনার প্রতি আসক্তি, উহার প্রতীকার ত্যাগ এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বর লাভ।

যতদিন এই অহং-এর মায়ায় মানুষ নিজের মধ্যে বদ্ধ থাকে, ততদিনই তাহার বাসনার অন্ত নাই এবং পিপাসার শান্তি নাই। মানুষের সহিত সূর্য্য-রশ্মিতে ভাসমান ধূলিকণার তুলনা করা যাইতে পারে। এই কণার সূর্য্য-অভিমুখ অংশটুকু জ্যোতির্ম্ময়, মর্ত্ত্য-অভিমুখ অংশটুকু অন্ধকার। মানুষ নিত্য এবং অনিত্য, ভাল এবং মন্দ, আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রন। ঈশ্বরের নিকট হইতে নীচের দিকে তাকাইলে সে কি দেখে? স্বরচিত অনিত্যতার কালো ছায়া দেখিতে পায়; এই ছায়াটি দেখিয়া সে মনে করে উহাই তাহার যথার্থ স্বরূপ, এবং মূঢ়ের ন্যায় তাহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। এই মিথ্যা অহং জ্ঞান, এই মায়া, এই অনিত্য বস্তু, যাহাকে সে অত্যন্ত আদরের সহিত আপনার মধ্যে পোষণ করে, ইহাই তাহার সমস্ত দুঃখ, দৈন্য এবং পাপের মূল। দৃষ্টি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সেই একের দিকে স্থির রাখিয়া, এবং যে অসত্যের অন্ধকার ছায়াকে সে নিজের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া, সত্য কি, তাহাই অনুসন্ধান করা তাহার পক্ষে আবশ্যক। সত্যকে জানিতে পারিলে সে কি দেখিবে? কেবলই মঙ্গল, আর কিছুই নহে। তখন তাহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরময় হইয়া উঠিবে। ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই দিব্য দৃষ্টি। এক কথায় ইহাই ঈশ্বরের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন। তীর্থযাত্রী দেবমন্দিরে পঁহুছিল; প্রেমিকের সহিত প্রিয়ের মিলন হইল। ইহার দ্বারা কি তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল? না, সে পরম 'অস্তি'র সহিত মিলিত হইল। সে কি পৃথিবীর সখ্যবন্ধন হারাইল? না, কারণ যাহা কিছু তাহার প্রিয় ছিল তাহা ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব, এবং তাঁহারই সহিত মিলিয়া সে যাহা ছিল তাহা ত রহিলই, এবং তাহা হইতে অনেক বেশী হইল; তাহার যাহা ছিল তাহা রহিল এবং সে আরও অনেক বেশী লাভ করিল। কিন্তু সে কি হইল এবং পাইল তাহা সে মুখে বলিতে পারে না এবং কেহ কানে শুনিতেও পারে না— "এই সকল কপট অনুসন্ধিৎসুরা অজ্ঞানী, কারণ সে যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহা সে প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করিব; "যে কথা হাজার হাজার বার বলা হইয়াছে তাহাই বলিব।" মস্‌নভি হইতে একটি সুন্দর অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।—

ধাতুরূপে মরে গিয়ে হলেম উদ্ভিদ্,
উদ্ভিদে মরিয়া পশু রূপেতে জীবিত।
পাইনু মানব জন্ম পশুরূপ হ'তে।
ভয় কেন তবে? মৃত্যু হরিল কি মতে?
মানব জনম অন্তে হয়ত এবার
প্রকাশিত হব রূপ ধরি দেবতার।
দেবতা হইতে আরো সমুন্নত স্তরে
লভিব কল্পনাতীত রূপ জন্মান্তরে।
আমি তবে 'নাই নাই' বাজে বীণা তারে,
জানিও নিশ্চয় শেষ তাঁহার মাঝারে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

হোমরের ইলিয়াড ওলিম্পস্ হইতে পারে কিন্তু তাহা হিমালয় নহে। কাব্যজগতের হিমালয় একা কেবল মহাভারত। রামায়ণ? রামায়ণ বড়জোর বিন্ধ্যাচল। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ। বশিষ্ঠ মুনি বিশ্বামিত্র রাজার মুখের সামনে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া এই যে একটি কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—"ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ধিক বল—ব্রাহ্মণের তপোবলই বল" এই কথাটিই রামায়ণের মূলমন্ত্র। ত্রেতাযুগে যে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশ বার

নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণসংগ্রহের জন্য দূরে হাতবাড়াইবার প্রয়োজন নাই—রামায়ণই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দশরথ রাজার অযোধ্যাপুরী ব্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়নে ত্রিসন্ধ্যা শব্দায়মান—সে মহাপুরীতে ক্ষত্রিয়বীরদিগের ধনুষ্টঙ্কারের কোনো সাড়াশব্দ নাই। রামায়ণের ক্ষত্রিয়কুলতিলক সবেমাত্র দশরথ এবং জনক; তাহার মধ্যে দশরথ রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জোড়হস্ত—জনকরাজা ব্রাহ্মণেরই সামিল; তা বই, দোঁহার স্বভাব চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে দেখা যায় ঠিক্ তাহার বিপরীত। রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও অনেক তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্ত্রকে সার করিয়া কুরুসৈন্যের দ্বিতীয় পদবীস্থ মহারথী হইয়া আপনাকে পরম শ্লাঘান্বিত মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণে বাল্মীকি মুনি ক্ষত্রিয়বলকে হনুমান সাজাইয়া মনে মনে খুবই হাস্য করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; মহাভারতের রচয়িতা ক্ষত্রিয়বলকে দেবতুল্য ভীষ্মে মূর্ত্তিমান করিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন; তা ছাড়া ক্ষত্রিয়বল যে কিরূপ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী মহাবল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আগাগোড়া তাহারই জলন্ত কাহিনী।

অর্জ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অবতার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধিদৈবিক অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দুই ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অর্জ্জুনের রথ চালাইবার ভার এবং অধর্ম্মের প্ররোচনা বাক্যের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ভার। শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অশ্বের রাশ এবং দক্ষিণ হস্তে অর্জ্জুনের মনের রাশ অপ্রমত্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া "যতো-ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই বাক্যটিকে জগজ্জনের সমক্ষে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মনুষ্যের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের পৃথক্ তিনটি পথ আছে—জ্ঞানের পথ, কর্ম্মের পথ, এবং ভক্তির পথ; তা ছাড়া, একটি মাঝের পথ আছে যাহা ঐ তিন পথের ত্রিবেণীসঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শেষোক্ত সঙ্গমতীর্থের পথে চালাইবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ হইতে যাত্রারম্ভ করিলেন। বলিলাম সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ—কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, সাংখ্যদর্শনের মতামত। মানুষের গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র যেমন মূলেই মানুষ নহে, তেমনি সাংখ্যদর্শনের মতামত মূলেই সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরকার কথা নহে। যাহা সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরের কথা তাহা বেদান্তশাস্ত্রেরও ভিতরের কথা। পক্ষান্তরে, সাংখ্যশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত এবং বেদান্তশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তদর্শনের মধ্যে যে জায়গাটিতে মতের অনৈক্য সে জায়গাটি বাদ-প্রতিবাদে এরূপ জটিলতাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্যে তোমার আমার ন্যায় সহজ মনুষ্যের দন্তস্ফুট হওয়া ভার; পরন্তু উভয়ের ঐক্যস্থানটিতে বেদান্ত এবং সাংখ্য যেন ঝিনুকের দুইটি কপাট, আর, সেই কপাটের অন্তরালে অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তা সংগোপিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের সেই সার কথাটিই অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে সাংখ্যবেদান্তের মর্ম্মগত ঐক্যস্থানটির মোটামুটি ভাবের যৎস্বল্প আভাস প্রদর্শন করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমি যদি বলি যে, "গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি" তবে "আমরা" এই যে একটি শব্দ আমি মুখে উচ্চারণ করিলাম এ শব্দটি "আমি" শব্দের বহুবচন তাহাতে তো আর ভুল নাই? তবেই হইতেছে যে, উহার অর্থ, অনেক আমি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমি তো আর অনেক নহি;—এই একঘর লোকের মধ্যে আমি একজন মাত্র বই না; "আমি" শব্দের বহুবচন বসিবে তবে কোথায়? তাহার বসিবার স্থান সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তবে জ্ঞানচক্ষু কিসের জন্য? শোনো তবে বলি:—যাহাকে আমি বলিতেছি "আমি" তাহা আমার জ্ঞানের সঙ্গে অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, একদণ্ডও সে আমার জ্ঞানের সঙ্গ ছাড়া নহে। আমার জ্ঞান যেখানে যায় সেও সেইখানে যায়। আমার জ্ঞান যখন তোমাতে যায় তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আটপহুরিয়া সঙ্গীটি তোমাতে দেখা দ্যায়—তুমির মধ্যে আমি দেখা দ্যায়। আমার জ্ঞানের এই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির এক মূর্ত্তি আমি আমাতে দেখিতে পাই, তাহার আর এক মূর্ত্তি তোমাতে দেখিতে পাই, তাহার কবিমূর্ত্তি কবিতে দেখিতে পাই, তাহার শাস্ত্রী মূর্ত্তি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে দেখিতে পাই, এমন কি তাহার অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্ত্তি পশু পক্ষীতেও দেখিতে পাই, তাহার সুষুপ্তমূর্ত্তি তরুলতাতেও দেখিতে পাই; তা শুধু না—আমার মধ্যেই আমার জ্ঞানের সেই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির একমূর্ত্তি দেখিতে পাই প্রাতঃকালের ভজনমন্দিরে, আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই মধ্যাহ্নকালের ভোজনমন্দিরে, আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই অপরাহ্নকালের কর্ম্মক্ষেত্রে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই সায়ংকালের বন্ধুসহবাসে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই রাত্রিকালের বিরামশয্যায়। এ তো দেখিতেছি নানা রঙের নানা আমি; অথচ আবার, "আমি" বলিতে একই সাদা রঙের আমি বুঝায়, তা বই নানা রঙের আমি বুঝায় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, একই সাদা রঙের আমির পক্ষে নানা রঙের আমি হওয়া

কিরূপে সম্ভবে? বেদান্ত বলেন, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি এক অদ্বিতীয় আত্মাতে নানাত্বের ভ্রম হয়। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা-ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন ভ্রম বলিয়া যে একটা পদার্থ তাহা আসিবেই বা কোথা হইতে, থাকিবেই বা কাহার আশ্রয়ে? বেদান্তদর্শন ইহার উত্তর দ্যা'ন এই যে,—ভ্রম "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং" অর্থাৎ ভ্রম আছে যে তাহাও নহে, নাই যে তাহাও নহে; ভ্রম অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র; তাহা কি যে তাহা বলা যায় না। বেদান্তদর্শন আরো বলেন এই যে, সেই যে ভ্রম বা অবিদ্যা যাহা অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র, তাহা অনাদিকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবেই পূর্ণব্রহ্মও অনাদি, অপূর্ণ জীবও অনাদি, ভ্রমও অনাদি। সাংখ্য বলেন যে, একই চন্দ্র যেমন জলের তরঙ্গে প্রতিবিম্বচ্ছলে নানারূপে ইতস্তত হয়, তেমনি প্রকৃতির বহু বা বিচিত্র কার্য্যকলাপের সাক্ষীস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার সেই বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বের সহিত আপনাকে জড়াইয়া মনে করেন যে, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদির এই যে সকল কার্য্য এ সকল কার্য্যের আমিই কর্ত্তা। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তিনি কোনো কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন, কার্য্য যাহা করিবার তাহা প্রকৃতিই করে। সাংখ্যের এই যে একটি কথা "চেতন পদার্থের প্রতিবিম্ব" এ কথাটি কবিতার হিসাবে শুনিতে অতি মনোহর, কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে এক-প্রকার সোনার পাথরবাটি—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাহাই হউক না কেন, সাংখ্য বেদান্তের এই সকল চিত্তবিভ্রান্তকারী মতামত এবং বাদপ্রতিবাদের পর্দ্দার আড়ালে উঁকি দিয়া দেখিলে একটি অমূল্য সত্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পুরাতন আচার্য্যেরা ভাবের চক্ষে সেই সার সত্যটি দেখিতে পাইয়া তাহার নাম দিয়াছেন "অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত।" অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত যে কাহাকে বলে, তাহার একটা মোটামুটি রকমের আভাস প্রদান করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব: তা বই, তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার অবকাশও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই।

মনে কর একজন অসামান্য ওস্তাদ গায়ক গান গাহিতেছেন এমনি চমৎকার যে তাহা শ্রবণ করিয়া ঘরসুদ্ধ লোক বলিতেছে যে, এমন মধুর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত আমরা কোথাও শুনি নাই। একটি প্রবাদ আছে যে, আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না। গায়ক আপনি মাতিয়াছেন বলিয়াই তিনি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গায়ককে কে মাতাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর এই যে অন্য কোনো ব্যক্তি গায়ককে মাতাইয়া তোলে নাই গায়ক আপনিই আপনাকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। গায়ক আপনারই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা আপনি পান করিতে করিতে আপনিই মাতিয়া উঠিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। এখানে দ্বৈতের ভাব দুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে অবিকল সমান। নাটমন্দির যেমন গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতা এই দুয়ের সম্মিলনস্থান, গায়কের মনোমন্দিরও তেমনি গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতার সম্মিলনস্থান; কেননা গায়ক আপনার গানের আপনি কর্ত্তা শুধু না—পরন্তু আপনার গানের আপনি কর্ত্তা এবং আপনি শ্রোতা দুইই একাধারে। দ্বৈতভাব তো দুই ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া গেল সমান; অদ্বৈতভাব কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ? অদ্বৈতভাবও দুই ক্ষেত্রেই সমান। গায়কের মনোমধ্যে একই ব্যক্তি যেমন গানের কর্ত্তা এবং গানের শ্রোতা নাটমন্দিরেও তেমনি একই গান যাহা গায়কের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে তাহাই শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের মন হইতে বাহির হইতেছে। চুম্বকের সান্নিধ্যে লোহা যেমন চুম্বক হইয়া যায়, তেমনি শ্রোতৃবর্গের মন গায়কের সঙ্গে গানে যোগ দিয়া গায়ক হইয়া উঠিতেছে। গান এমনি জমিয়া গিয়াছে যে, গায়ক শ্রোতৃবর্গের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করিতেছেন আর শ্রোতৃবর্গ গায়কের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া গানের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন। অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত শুধু কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞানের কথা নহে। তাহা সমস্ত জগতের প্রাণের কথা। উপনিষদে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" নিশ্চয়ই আনন্দ হইতে জীব-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবনধারণ করে এবং আনন্দেতেই অভিনিবিষ্ট হয়। এষহ্যেবানন্দয়াতি। গায়ক যেমন আপনার গানে আপনি মাতোয়ারা হইয়া সভাসুদ্ধ লোককে মাতাইয়া তোলেন, পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দে আপনি ভোর হইয়া নিখিল জগৎকে আনন্দায়মান করেন। আর একটি কথা এই যে, জনসমাজের ভাগ্য যখন এইরূপ সুপ্রসন্ন হয় যে, বড়'রা ছোটোদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিতেছে ছোটোরা বড়দিগকে ভক্তিচক্ষে দেখিতেছে, সমানে সমানে নানাসূত্রে প্রীতি এবং সদ্ভাব ঘনীভূত হইতেছে, তখন, নানা যন্ত্রের নানা ধ্বনির মধ্য হইতে যেমন নব নব রাগের সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত জাগিয়া ওঠে, তেমনি নানা জনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে মহাশ্চর্য্য একাত্মভাব জাগিয়া ওঠে। সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যসুন্দরমঙ্গলরূপী আত্মার ভাব আপনাতে এবং লোকসমাজে ফুটাইয়া তোলাই সাধনের প্রধান লক্ষ্য; আর সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে

জাগ্রত রহিয়াছেন—এই সত্যটির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের এই যে এ-কটি সারকথা যে "আত্মা অজর অমর এবং স্থির"—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জুনকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন। যদি বল যে,তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার বস্তু,তা বই তাহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার বস্তু নহে। প্রমাণ শব্দের মৌলিক অর্থ মাপা। পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা দোকানের পুঁজি হইতে একখানি পছন্দসই বস্ত্র বাছিয়া লইয়া তাহা প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার ধার ঘেঁসিয়া এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত আপনার দক্ষিণ হস্ত উত্তরোত্তরক্রমে আরোপ করিয়া বলেন যে, এ বস্ত্রখানি এত হাত লম্বা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত ক-হাত লম্বা; তবে তিনি হাসিয়া বলিবেন "একহাত লম্বা।" তাঁহার এ কথায় সন্তোষ না মানিয়া পার্শ্বস্থিত কোনো তর্কালঙ্কার যদি বলেন যে, "ঐ বস্ত্রখানি ক-হাত লম্বা তাহা যেমন তুমি মাপিয়া দেখিলে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে এক হাত লম্বা তাহা তুমি আমাকে সেইরূপ করিয়া মাপিয়া দেখাও" তবে ক্রেতা তাঁহাকে কি বলিবেন তাহা জানি না; কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় তর্কচূড়ামণিদিগের সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে একটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমি অনেকবার অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি; সে কথা এই;—

মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে।

এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥

প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করিতেছে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে (অর্থাৎ জ্বালানে কাঠে) দাহিকাশক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিতে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে যে সকল সার সার জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে—শ্রোতৃবর্গের উচিত যে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন। কেননা শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্ভমুহূর্ত্তে যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য অনুনাদিত করিয়া দশ শত বীরের দশ শত শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আর, তাহার পরক্ষণেই ভেরী পণব আনক গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল, তখন কুরুসৈন্য দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া শস্ত্র চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন ধনুক বাগাইয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার তাহা আমি নিরীক্ষণ করিতে চাই—উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর।" অর্জ্জুনের এই কথামতে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহামহারথীদের সম্মুখ ভাগে রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন "দেখ এই কুরু-সবে একত্রে সমবেত।" অর্জ্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন পিতৃগণ পিতামহগণ আচার্য্যগণ মাতুলগণ ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ পৌত্রগণ ভাই বন্ধু সুহৃদগণ যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন "এই সব আত্মীয় স্বজনকে, কৃষ্ণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুখাইয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কম্প ধরিয়াছে, গাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে; আর দৈব লক্ষণ দেখিতেছি বিপরীত বিপরীত। আত্মীয় স্বজনকে রণে হত্যা করিয়া মঙ্গল কিছুই দেখিতেছি না। আমি বিজয় চাহি না, কৃষ্ণ, রাজ্য চাহি না, সুখ-সমৃদ্ধি চাহি না। কি হইবে আমার রাজ্যে, কি হইবে ভোগ-বাহুল্যে, কি হইবে বাঁচিয়া থাকিয়া? যাঁহাদের জন্যে আমার রাজ্যের প্রয়োজন, ভোগৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন, সুখ-সমৃদ্ধির প্রয়োজন—তাঁহারাই—পিতৃপিতামহ আচার্য্য ভাই বন্ধুরাই ধন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান, ইঁহাদের হস্তে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল তথাপি ইঁহাদের আমি মৃত্যু কামনা করি না; পৃথিবী কোন্ ছার, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও ইঁহাদের হত্যাকার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া কি আমার লাভ হইবে, জনার্দ্দন! এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করিলে লাভের মধ্যে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান সন্ততিগণকে সবান্ধবে হনন করা কোনো ক্রমেই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিয়া কোন্ প্রাণে আমরা সুখী হইব। এরা সবে লোভে হতচেতন হইয়া যদি বা দেখিতেছে না কিন্তু কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহ যে কি ভয়ানক পাপ আমরা তো তাহা জানি! উঃ কি মহাপাপ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি! রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া দিয়া এবং প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টা না করিয়া কৌরবগণের হস্তে যুদ্ধে নিহত হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিয়া শোকের আবেগে বসিয়া পড়িলেন। অর্জ্জুনকে এইরূপ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ-লোচন এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "যুদ্ধস্থলে আর্য্যবিগর্হিত স্বর্গের পথরোধকারী এ পাপ কোথা হইতে তোমাতে আসিয়া উপস্থিত হইল? এরূপ হতোদ্যম ভাব কাপুরুষদিগকেই শোভা পায়, তোমাকে শোভা পায় না কৌন্তেয়। ক্ষুদ্র জনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য

ঝাড়িয়া ফেলিয়া ওঠো, পরন্তপ!” অর্জ্জুন বলিলেন “ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়েই আমার পূজার্হ—তাঁহারা যদি বা আমার প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কেমন করিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিব? মহানুভাব গুরুগণকে হত্যা করিয়া রক্তকলুষিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করা অপেক্ষা গুরুহত্যা পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করা শত গুণ শ্রেয়। এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয় ভাল কি পরাজয় ভাল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া সুখ নাই তাঁহারাই যুদ্ধার্থে সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার স্বাভাবিক বলবীর্য্য কৃপাদৌর্ব্বল্যে পর্য্যাকুলিত হইয়াছে। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চিত মতে বলো—আমি তোমার প্রণত শিষ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান কর। যে শোক আমার সর্ব্বশরীর শোষণ করিতেছে, তাহার উপশম হইবে কেমন করিয়া তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হই তাহাতেই বা কি, আর, আমি যদি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করি তাহাতেই বা কি—এ শোক কিছুতেই শান্তি মানিবার নহে। আমি যুদ্ধ করিব না।” এই বলিয়া অর্জ্জুন বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন।

উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনকে এইরূপ বিষাদে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সাংখ্যশাস্ত্রের কয়েকটি সার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন “অশোচ্যদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতেছ; এটা জেনো স্থির যে, লোকের মরণ বাঁচনে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব যৌবন জরা যেমন অবশ্যম্ভাবী দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান হ’ন না। আত্মা কোনো কালে জন্মেনও নাই মরেনও না,—শরীর হত হইলে আত্মা হত হ’ন না। শস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইয়া নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, অচল, সনাতন। ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া পণ্ডিতেরা ইঁহার জন্য শোক করেন না। অতএব সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়—দুইই সমান জানিয়া যুদ্ধে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এ যাহা তোমাকে আমি বলিলাম এ বুদ্ধি সাংখ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আরো এক প্রকার বুদ্ধি যোগের মধ্যে পাওয়া যায়—যে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে কর্ম্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। সে বুদ্ধি কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।”

এখানে এইটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত যে, বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, শুনিতেছেন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যদি আর কেহ হইতেন, আর, অর্জ্জুন যদি সামান্য একজন শোকসন্তপ্ত গৃহস্থ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন তাহার একটি কথাও যদিচ অসত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্বেও বিদ্যুতের আলোক যেমন একগুণ অন্ধকারকে দশগুণ করিয়া তোলে, তেমনি বক্তার মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানের কথা শ্রোতার এক গুণ প্রাণের বেদনাকে দশ গুণ করিয়া তুলিত, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যে মানুষ স্নেহের পাত্রটিকে বা প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধুকে জন্মের মতো হারাইয়া জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে—তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহার নিকটে নিতান্তই বাজে-কথার সামিল। সে বলিবে যে, “আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই—যাহাকে আমি হারাইয়াছি তাহাকেই আমার প্রয়োজন।” ইহার উত্তরে উপদেষ্টা যদি বলেন যে, “অনিত্য বস্তুর উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে সকলেরই এইরূপ দশা হয়, তোমার শুধু নহে।” এ কথার উত্তরে সে ব্যক্তি মুখে না বলুক্—মনে মনে নিশ্চয়ই বলিবে যে, “নেই মামা অপেক্ষা কানামামা ভাল; চিরস্থায়ী অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী আলোক ভাল; অবিনাশী আত্মা হইয়া অনন্তকাল বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এক মুহূর্ত্ত যদি আমি সেই হাসি মুখখানি আর একবার চক্ষে দেখিতে পাই তবে কি ধন না লাভ করি; সে ধনের তুলনায় স্বর্গই বা কি, আর মোক্ষই বা কি, সবই আমার নিকটে তৃণতুল্য।” এ রোগের ঔষধ যদি কিছু থাকে তবে, সে ঔষধ বিবেক, বৈরাগ্য এবং সংযম। অবিবেকী ব্যক্তি যে ক্ষণিক সুখের তুলনায় আত্মাকে অবিনাশী অন্ধকার মনে করিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রাম সংস্কৃত ভাষার ক-অক্ষরও জানে না—এরূপ স্থলে শ্যাম যদি তাহাকে সরস সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া শুনায়—তবে রাম তো বলিবেই যে, “আমার কানের কাছে সওস্কিড়িমিড়ি করিও না।” প্রকৃত কথা এই যে আত্মা শুধু যে কেবল আছে মাত্র তাহা নহে, আত্মা জ্ঞান প্রেম এবং আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া আত্মাকে পাইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাই। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির উদ্যান। আত্মাকে পাইয়া পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্ন একদিকে—আর, আত্মা একদিকে—আত্মার তুলনায় সে সব ধন রত্ন অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম। আত্মা যদি কেবল আছে মাত্র হইত তাহা হইলে আত্মাকে জানিবার জন্য কাহারো কোনো মাথাব্যথা

হইত না। বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা অস্তি ভাতি এবং প্রিয় এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থির প্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। পুষ্করিণীতে পঙ্ক জমিয়া তাহার জল যখন অব্যবহার্য্য হয়, তখন পুষ্করিণীকে যেমন ঝালানো আবশ্যক, তেমনি, বিবেক বৈরাগ্য এবং এবং সংযম দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক; তা নহিলে আত্মা সাধকের ভোগে আসিতে পারে না। মোট সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে এটা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা উচিত যে, সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ জ্ঞানে আয়ত্ত করা চাই — কারক বিভক্তি সর্ব্বনাম উপসর্গ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিধিমতে পরিচয় লাভ করা চাই, তাহার পরে সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া ব্যাকরণ জ্ঞানকে কিরূপে ভাষার ব্যবহার-কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হাতে কলমে করিয়া শেখা চাই, তা নহিলে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদনে বিদ্যার্থী ব্যক্তির অধিকার জন্মিতে পারে না। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "একে তো ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনো রসকস নাই তাহাতে আবার শব্দের ইঁট কাট জড়ো করিয়া বাক্যের ভিত গাঁথিয়া তোলা এক প্রকার রাজমজুরের কাজ—তাহাতে আমার মন যাইতেছে না, আমি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই আমাকে অধ্যয়ন করা'ন" তবে এটা যেমন বিদ্যার্থী ব্যক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা, তেমনি সাধক যদি আচার্য্যকে বলেন, যে, "তত্ত্বজ্ঞান অতিশয় নীরস, শমদমাদির সাধন অতিশয় কঠোর, এ সকলেতে আমার মন যাইতেছে না—যাহাতে আমি আধ্যাত্মিক প্রেমানন্দ হাত বাড়াইয়া পাইতে পারি, সেই বিষয়ে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন" এটাও উহা অপেক্ষা বেশী বই কম দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সাধনের পাঁচটি সোপান-পংক্তি উত্তরোত্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপঃ—প্রথম পঁইটা শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি, চতুর্থ পঁইটা সমাধি, পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা। গীতার প্রথম উপক্রমেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রতি শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম পঁইটা, যদিচ সে কথাটি হোমিওপাথিক বটিকার ন্যায় বিন্দু-পরিমাণ, সে কথা এই, যে, আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার। সংক্ষেপে—আত্মার ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সাধনের প্রথম পঁইটা। এ বিশ্বাস লোকের মুখে শোনা কথায় বিশ্বাস নহে—পরন্তু আপনার অন্তরতম প্রদেশের জানা কথায় বিশ্বাস। পরিব্রাজক যেমন এটা নিশ্চয় জানে যে, সে যখন গন্তব্য পথে চলিতেছে তখন আকাশস্থিত চন্দ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে না, সাধক তেমনি এটা নিশ্চয় জানিতেছেন যে, তাঁহার শরীর মন এবং বাহিরের বস্তু সকল যখন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপী আত্মা উহাদের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন না—আত্মা স্থির রহিয়াছেন। এ কথা অন্যের মুখে শোনা কথা নহে—পরন্তু সাধকের আপনার অন্তরের জানা কথা। এইরূপ আপনার অন্তরের জানা কথার উপরে ভরপূর বিশ্বাস স্থাপন করাই সাধনের প্রথম পঁইটা। দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাকে কার্য্যে ফলাইয়া তুলিতে হইলে যেরূপ বীরত্বের প্রয়োজন হয় সেইরূপ বীরত্ব। ভাব এই যে, শমদমাদির সাধনে এবং অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অপ্রতিহত উদ্যম এবং উৎসাহই সাধনের দ্বিতীয় পঁইটা। তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি, ভাব এই যে, শমদমাদি এবং নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন যখন অভ্যাস-গতিকে সাধকের স্মরণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায় তখন আত্মাতে এক প্রকার অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রসন্নভাব সঞ্চার হয়, এইরূপ আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদই সাধনের তৃতীয় পঁইটা। সাধনের চতুর্থ পঁইটা সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা। ভাব এই যে, সাধকের মনে যখন আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদ পরিস্ফুট হয়, তখন সাধকের মন লক্ষ্য-বিষয়ে অবিচলিত ভাবে নিবিষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষ্যবিষয়ে মনের স্থৈর্য্যই সাধনের চতুর্থ পঁইটা। পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান। ভাব এই যে, আতস পাথরের অর্থাৎ magnifying glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরবাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে—তেমনি, আত্মশক্তি সহকারে মন লক্ষ্য-বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুতে জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। এইরূপ অবস্থায় সাধকের পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান সকল বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বজগৎ দর্শন করে, ইহারই নাম যোগ, ইহাই সাধনের পঞ্চম পঁইটা,—সাধক যখন এই পঞ্চম পঁইটাতে উত্তীর্ণ হ'ন তখন তাঁহার মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। গীতা-শাস্ত্রে দুইরূপ আনন্দের উল্লেখ আছে,—প্রথম, মাঝপথের আনন্দ বা সাধনের আনন্দ; দ্বিতীয়, গম্যস্থানের আনন্দ বা সিদ্ধিলাভের আনন্দ। মাঝপথের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপঃ—

"রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

সাধক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনাকে আপনার বশে রাখিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। আত্মপ্রসাদে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্য বস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। ভাব এই যে, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে আত্মার সহজ আনন্দ আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়, আর সেই সহজ আনন্দের গুণে সাধক যাহাতে মন বসাইতে ইচ্ছা করেন তাহাতেই তাঁহার মন ভরপুর নিবিষ্ট হয়। এই গেল সাধকের মাঝপথের আনন্দ। গম্যস্থানের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ :—

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সেখানে অর্থাৎ যোগের অবস্থায় সাধক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিতে পা'ন; আর সেখানে স্থিত হইলে সাধক তত্ত্ব হইতে বিচলিত হ'ন না। সেখানে সাধক যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা অপর কোনো লাভকেই তিনি অধিক মনে করেন না; আর, সেখানে স্থিত হইয়া গুরু বিপদেও বিচলিত হ'ন না। আনন্দ সম্বন্ধে মাঝে এ যাহা আমি কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, ইহা পঞ্চম পঁইটার কথা। গোড়ায় আমি যাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি তাহা সবে মাত্র প্রথম পঁইটার কথা। গীতার দ্বিতীয় পঁইটায় কঠোর কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের বিধেয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্ম পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত। আগামী বারে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের পদ্মানদী পার হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্ধের দৃষ্টিলাভ।

অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলে কিরূপ হয় তাহার একটি আশ্চর্য্য বিবরণ ডাক্তার এড্ওয়ার্ড আয়ার্স্ আলোচনা করিয়াছেন।

"ফ্রাঙ্কলিন্ জন্" নামে এক ব্যক্তির চোখে ছানি পড়ার দরুণ সে জন্মান্ধ ছিল; যখন তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স তখন ডাক্তারেরা এই ছানি কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সে তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি আশ্চর্য্য প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহাভিমুখী পায়রার মত সে পথ খুঁজিয়া বাড়ি আসিতে পারিত; কাহাকেও ধরিতে হইলে কেবল ঘ্রাণ লইয়া সে ব্যক্তি কোন্ পথে গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুধাবন করিত; খুব দক্ষতার সহিত ঘোড়ার ব্যবসায় চালাইত এবং কোন্ জিনিসের কি রঙ তাহা সহজেই বলিয়া দিত।

দৃষ্টি লাভ করিলে প্রথমে তাহাকে একটা গোলা এবং চৌকা বাক্স দেখানো হইল। তাহাদের আকার কি তাহা সে স্পর্শ না করিয়া বলিতে পারিল না। তবু তৃতীয়বার যখন তাহাকে দেখানো হইল তখন সে স্পর্শ না করিয়াই বুঝিতে পারিল। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া চোখ্ বন্ধ করিল এবং কিছুক্ষণ পর বলিল বাক্সটা চৌকা এবং গোলাটা গোল। চোখে দেখিয়া তাহার পর স্পর্শ করিয়া, দৃষ্টি এবং স্পর্শের বোধ একত্র করিয়া, তবেই জিনিষ পত্রের কোন্‌টার কি আকার তাহা সে বুঝিতে পারিল। পর দিন তাহাকে পরিমাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইল। এক ফুট কতটা লম্বা তাহা সে তাহার ছড়িকে দুই হাতে ভাগ করিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু যখন একটা বারো ইঞ্চি লম্বা এবং চার ইঞ্চি মোটা লাঠি দূরে ধরিয়া তাহার পরিমাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন সে বলিল তাহা চার ইঞ্চি লম্বা এবং তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা। লাঠিটা যখন আবার কাছে আনিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইল তখন সে ভুল সং-শোধন করিয়া লইল। প্রথমে সে এইরূপে দূর হইতে মানুষ এবং জন্তুর আকার লইয়া মহা গোলে পড়িত কিন্তু অল্প দিনেই তাহার এ ভুল কাটিয়া গেল। তাহার পর সংখ্যা লইয়া গোল বাধিল; চার পাঁচ বার চেষ্টা করিয়া তবে তাহাকে এক দুই হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে শিখানো হইল। পাঁচের পর আর পারিল না। বর্ণবোধ শক্তি পরীক্ষা করিবার সময় ডাক্তারেরা যে সকল বিচিত্র রঙের রেশমের সুতার গুচ্ছ ব্যবহার করেন তাহা "ফ্রাঙ্কলিন জন্‌কে" দেখানো হইলে অনেক ভাবিয়া সে লাল, হল্‌দে, সবুজ এবং নীল রং কয়টা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিতে পারিল। রং দেখিয়াই, শিক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই, যখন সে কোন্‌টা কি রং তাহা বলিতে পারিল তখন নিশ্চয়ই যখন অন্ধ ছিল তখন বর্ণের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল। কেমন করিয়া অন্ধ অবস্থায় তাহার বর্ণজ্ঞান জন্মিল সে সম্বন্ধে ডাক্তার আয়ার্স্ নানা রকম কাল্পনিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু কিছু প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বক্তব্য এই যে আলোকের স্পন্দন তরঙ্গ চোখের ভিতর

দিয়া না গিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াও মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিতে পারে।

জন্তুরা কেহ কেহ একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়কে অন্যগুলি অপেক্ষা বেশী কাজে লাগায় এবং কেহ কেহ এক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ সম্পন্ন করাইয়া লয়, যেমন শব্দ এবং আলোক অনেক জন্তু স্পর্শ করিয়া বোধ করে। খরগোসের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা গেছে তাহার শতভাগের দশভাগ অংশ কেবল ঘ্রাণবোধের কাজ করে; মানুষের যে পরিমাণে আছে ইহা তাহার প্রায় শতগুণ। শামুকের নরম শুঁড়ে এতগুলি চোখ আছে যে একটা গভীর গর্ত্তের ভিতরে না প্রবেশ করিয়াও তাহার ভিতর কি আছে তাহা সে দেখিতে পায়। এখানে স্পর্শের বদলে দৃষ্টি কাজ করিতেছে। কীটের শরীরে একপ্রকার দাগ আছে, তাহাদ্বারা সে আলোকের উত্তাপ অনুভব করিতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে একই প্রকার বোধের জন্য নানা জন্তুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কাজ করে। কিন্তু তবু কেমন করিয়া জন্ স্পর্শ করিয়া কোন্‌টা কোন্ বর্ণ তাহা বলিয়া দিত এই সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন। একটি ইন্দ্রিয়ের উপর কম্পন আসিয়া আঘাত করিয়া আর একটি ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে কি না! বর্ণের কম্পন স্পর্শের স্নায়ুর ভিতর দিয়া দৃষ্টির ক্ষেত্রে আসিতে পারে কি না? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, না, পারে না; তবে বর্ণের মধ্যে আলোকতরঙ্গ ব্যতীত স্পর্শবোধ্য আর কিছু পদার্থ যদি থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোনো বস্তুতে উত্তাপ, আলোক, বৈদ্যুত, চৌম্বক, এবং রন্টগেন্ রশ্মি প্রয়োগ করিলে তাহার ফলে ঐ বস্তুতে যে কম্পনতরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহাদের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে। এই ছোট বড় স্পন্দন আসিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি কোন্‌টা কি। বেগুণী রঙের অপেক্ষা লাল রঙের উত্তাপ প্রায় দ্বিগুণ। মানুষেরা কি এই উত্তাপের তারতম্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে? না, কিন্তু একটা মোম বাতিতে যতটুকু উত্তাপ আছে ততটুকু উত্তাপের বস্তু দেড় মাইল দূরে থাকিলেও ল্যাংলীর বোলোমীটর যন্ত্রের ধাতব ইন্দ্রিয়ে তাহার স্পন্দন ধরা দেয়। জন্ যখন প্রথম আপেল দেখিয়াই বলিল তাহার রঙ সবুজে লালে মিশ্রিত তখন হয়ত সে আপেলটার সমস্তটা এক রঙের নয় দেখিয়া কতকটা আন্দাজে ঐ দুইটি রঙের নাম উল্লেখ করিয়াছিল। কিম্বা সে যখন অন্ধ ছিল তখন আমরা চোখে দেখিয়া যাহা বোধ করি তাহা সে স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিত; এই জন্যই সে এখন স্পর্শ করিবামাত্রই ঠিক্ বলিয়া দিল আপেলের রঙ কি। এখনো খবরটা মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিল ঠিক্, কিন্তু ভিন্ন দ্বার দিয়া।

ঘরের বাতাস যখন ঠাণ্ডা তখন ঘরের আসবাবপত্র অপেক্ষাকৃত গরম এবং বাতাস যখন গরম তখন সেগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধ অবস্থায় জন্ যখন ঘরের আসবাব এড়াইয়া চলিত তখন সে নিশ্চয় তাহার অসামান্য স্পর্শবোধের দ্বারা এই তাপের তারতম্য অনুভব করিয়া বাধা বাঁচাইয়া চলিতে পারিত।

অন্ধ অবস্থায় জন্-এর বাড়ি চিনিয়া যাইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ঘন বন, অন্ধকার রাত্রি, পেঁচার ডাক এবং বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই; বাড়ি এত দূরে, যে কোনোরকম পরিচিত গন্ধের কণামাত্রও নাকে প্রবেশ করিতে পারে না; রাস্তাও আকাবাঁকা। এই অবস্থায় যখন তাহার ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি নির্ব্বাসিত কয়েদীর মত দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কোন্ অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া তাহার সহায়তা করে? কেমন করিয়া সে এরূপ অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়া আসে? কেমন করিয়া যে তাহা "ফার্মার জনও" বলিতে পারিত না। যখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল তখন তাহার এই সকল তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তি চলিয়া গেল বটে কিন্তু সে ঘোড়ার ব্যবসায় যেমন চালাইতেছিল তেমনি চালাইতে লাগিল।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমবায়-কৃষিসমিতি।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা যে ক্রমশঃই হীন হইয়া পড়িতেছে এই বাণিজ্যমদমত্ত ঔপনিবেশিক জাতি এতকাল পরে তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাণিজ্য ও সহরের নানা প্রকার উত্তেজনা গ্রাম হইতে শ্রমজীবিদিগকে সহরে টানিয়া আনে এবং ইহার ফলে একদিকে যেমন কৃষির উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায় অপর দিকে শ্রমজীবিরও জীবনযাত্রা সহরের চাঞ্চল্যে ও সেখানকার কর্ম্মক্ষেত্রের তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পেষণে দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে। যে সকল শ্রমজীবিগণকে কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার; এই অবস্থা হইতে কোনো প্রকারে তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প। শ্রমজীবিকে কৃষক হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু কৃষককে সমস্ত পরিবারসহ শ্রমজীবির কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে এমন ঘটনা

প্রতিদিনই ঘটিতেছে। ছোট ছোট জোতের জমি ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার ফলে কৃষকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। এই জাতীয় সমস্যার মীমাংসার একটা পথ আবিষ্কার করিবার জন্য "Small holdings and Allotments Act" আইন পাশ হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সফলতা লাভ করিতে পারিল না।

যে জাতির ভিতরে মঙ্গলানুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা বাণী জাগিয়া উঠে, সে জাতি সমস্ত বাধাকে সমস্ত বিফলতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোনো না কোনো উপায়ে কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিয়া লয়ই। যখন রাজবিধি সফল হইল না, তখন চিপরফীল্ড নামক একটী গ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সম্মিলিত চেষ্টায় এই সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে 'সমবায় কৃষি সমিতি' স্থাপন করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সমিতিটী 'কৃষি-ব্যবস্থা সমিতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইল। সমিতির নিয়ম হইল এই যে জোতদারগণকে তিন বৎসরের খাজনার অনুপাতে অংশ কিনিতে হইবে অর্থাৎ একটী অংশ লইলে অংশীদার বাৎসরিক ছয় শিলিং আট পেন্স হারের খাজনানুযায়ী জমি দখল করিতে পারিবে। যদি বাৎসরিক খাজনা এক পাউণ্ড হয় তবে তাহাকে তিনটী অংশ ক্রয় করিতে হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, কার্য্যপ্রণালী, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া শ্রমজীবিদিগকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকজন আহ্বান করিয়া এক সভা আহূত হইল। সমবায়কৃষিসমিতির ব্যবস্থা শুনিয়া প্রথমতঃ গ্রামবাসীরা পিছুপাও হইয়া পড়িল কেননা তাহারা যে কোনোদিন জমি পাইবে তাহার কোনো সম্ভাবনাও তাহাদের কাছে প্রত্যয়যোগ্য মনে হইল না। জমি হইতে কর্ম্মিষ্ঠ কৃষক যে লাভ করিবে অসমর্থ চাষীর সঙ্গে তাহা তাহাকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, "অংশ" কথাটির এই অর্থ আশঙ্কা করিয়া তাহারা যেন আরো একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিছু কাল পরে ১৫ জন শ্রমজীবি অংশ গ্রহণ করিল এবং ১৯১০ সালের প্রথমে সমিতির কর্তৃপক্ষেরা ৪৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করিতে পারিলেন। অনতিবিলম্বে অংশীদারের সংখ্যা ৩৬ জন হইল। তাহারা একত্রিত হইয়া জমি ভাগ করিয়া লইল এবং তৎপরিমাণে খাজনা ধার্য্য করা হইল।

সমিতির চেষ্টার ফলে ৪৫ বিঘা জমি আজ এক বৎসরের মধ্যেই নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শুধু কৃষির উন্নতি নয় যাহাদিগকে জমিটুকু আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিতেছে তাহাদেরও জীবন শিক্ষা স্বাস্থ্যে সফলতায় গড়িয়া উঠিতেছে।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমবায়কৃষিসমিতি কি স্থাপন করা যাইতে পারে না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যর্থতা।

শুধু এই সব, এই সব?
আপনার কানে শুনিব কি বসে
আপনারি কলরব?
শুধু ভুলে থাকি আপনার সুখে,
আপন বেদনা বহি সদা বুকে;
শূন্য বাক্য কহি' নিজ মুখে
পূর্ণতা অনুভব।
এই সব, এই সব?

শুধু এই খেলা খেলে সবে?
আপনার পিছে ছুটি' কিগো কভু
আপনারে কেউ পাবে?
সকলের মাঝে প্রবেশের দ্বার
বন্ধ করিয়া ভাবে বার বার
এই ত পূর্ণ হয়েছে আগার
সবি আছে, কিবা চাবে!
এই খেলা খেলে সবে?

শুধু কেবলি এ জটিলতা
পথে পথে মোর বাধা আছে পায়
বলে মোরে যাবে কোথা?'
যে মালা কণ্ঠে পরাইতে চায়
চোরা কাঁটা তার বেঁধে মোর গায়।
কারে চাহি মন দু'হাত বাড়ায়,
কি লাগি চঞ্চলতা!
কেবলি এ জটিলতা।

শুধু এই সব, এই সব?
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে
আপন কণ্ঠরব?
আপনার সুখ, আপনার দুখ
সব হতে মোরে করিবে বিমুখ?

হবে না চিত্তে কভু জাগরুক
বিপুল সে অনুভব ?
এই সব, এই সব ?
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নানা কথা।

জাতির স্বাতন্ত্র্য। বিদেশীর আমদানীকে দেশের লোকে একটা উৎপাত মনে করে। এই জন্য আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পরদেশীকে দূরে রাখিবার জন্য একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই উপলক্ষ্যে ফ্রান্সদেশের মনীষী জিয়ঁ ফিনো কন্টেম্পোরারি রিভিয়ুপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন নবাগত বিজাতীয়ের সহিত দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাবের মিল হইবে কেন এই একটা ভাবনা, কিন্তু যাঁহারা কোন মহাজাতির মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন মানব মন আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকের সম্মিলিত সমাজের মনের কাছে পরাভব মানে। একই রকম সুবিধা অসুবিধা ও একই রকম মানস-প্রকৃতির মধ্যে গিয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে নবাগতেরা পুরাতন দেশবাসীদের মত হইয়া যায়। আমেরিকায় যে সকল ইহুদি জার্ম্মান প্রভৃতি বিদেশী যায় তাহারা এক পুরুষের মধ্যেই সম্পূর্ণ আমেরিকান হইয়া পড়ে।

আচ্ছা বেশ, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক প্রকৃতি জাতিবিশেষের মানসিক প্রকৃতির কাছে আপন বিশেষত্ব যেন বিসর্জ্জন করিল কিন্তু শারীরিক প্রভেদ ত এত সহজে দূর হয় না। ইহার উত্তরে লেখক বলেন, বিচিত্র জলবায়ু ও বিচিত্র পরিবেষ্টনের মধ্যে যাহারা গিয়া পড়িয়াছে এমন সমস্ত লোকের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আমি আমার একটি গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়াছিলাম যে, দেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত শারীরিক বিশেষত্বও লোপ পায়। কিন্তু কয়েক পুরুষ না গেলেও যে মস্তকের গঠনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তখন এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। কারণ, তখন সাধারণত এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মাথার আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে ঘটে অথবা একেবারে ঘটেই না। অতএব মাথার আকৃতির বিশেষত্বই এক জাতি হইতে অন্য জাতির প্রধান স্থায়ী ভেদচিহ্ন, বৈজ্ঞানিক মহলে এই সংস্কারই দৃঢ় ছিল।

মাথার আকৃতি ও আয়তনের দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ করা যাইতে পারে তখন এই বিশ্বাসটিও প্রবল ছিল। জর্ম্মানদের মাথা যত লম্বা তত চওড়া নহে এই কারণে তখনকার একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন লম্বা মাথাই আদর্শ মাথা—এবং জর্ম্মান জাতিই বুদ্ধির উৎকর্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের অসভ্য জাতিরও মাথার গঠন জার্ম্মানদের ন্যায় লম্বা এবং ইহাও লক্ষ্য করা হইল যে যতই দিন যাইতেছে ততই য়ুরোপে লম্বা মাথা বিরল হইয়া গোল মাথারই প্রাদুর্ভাব হইতেছে তখন এইমত পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত আমেরিকান মানবতত্ত্ববিদ্ মাথার আকৃতি সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে আমেরিকায় যে বিদেশীরা যায় তাহাদের প্রায়ই এক পুরুষের মধ্যে মাথার পরিবর্ত্তন ঘটে; তা যদি কোনো ক্ষেত্রে নাও হয় তবে দুই পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবেই। বিদেশ হইতে নব আগন্তুকদের শারীরিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য আমেরিকায় একটি কমিশন স্থাপন করা হইয়াছে। নানা জাতির বহুতর মানুষকে লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পরে সেই কমিশন হইতে যে সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এমন সকল তথ্য পাওয়া যায় যাহা আলোচনা করিলে অনেক ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া যে নানা আকারের মাথা অল্প কালের মধ্যেই আমেরিকান মাথার ন্যায় হইয়া যাইতেছে তাহা পড়িলে বড়ই আশ্চর্য্য লাগে। ভিন্ন জাতির সহিত পরস্পর বিবাহাদি করিয়াই যে বিদেশীদের এই সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে; যেখানে বিবাহ হয় নাই সেখানে শুদ্ধমাত্র স্থানীয় প্রভাবেও এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছে। তবেই প্রমাণ হইতেছে জাতির স্বাতন্ত্র্য লইয়া আমাদের যে জাত্যাভিমান আছে তাহা অমূলক। দেশ আছে বটে কিন্তু জাতি নাই। এক এক দেশ এক এক রকম মানুষ গড়িয়া তোলে। জাতির কোনই স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।

রণক্ষেত্রের কুকুর। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পাই যে এমন এক দিন ছিল যখন শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য হিংস্র কুকুরের দলকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা হইত। ফ্রান্সের পঞ্চম চার্ল্‌সের এইরূপ চার হাজার সাহসী যোদ্ধা কুকুর ছিল। জার্ম্মানির অসভ্য জাতি এই সকল হিংস্র জন্তুর দ্বারা রোমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। প্লিনি বলেন খৃষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও কুকুর লইয়া যুদ্ধ করা হইত।

এখন কুকুরদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজের জন্য তৈয়ারী করা হইতেছে। তাহারা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের কাজে শিক্ষালাভ করিতেছে। রণভূমির হাঁসপাতাল বিভাগের চিহ্ন রক্তবর্ণ ক্রস্‌। এই কুকুরগুলিকে রক্ত-ক্রস্‌ কুকুর বলা হয়। ডাক্তার ঃডেরিয়াঁ ফরাসী সৈন্য বিভাগের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বলেন ঃ—

এই রক্তক্রস কুকুররা লালক্রস-চিহ্নধারী হাঁস-পাতালের ডাক্তার ভিন্ন আর কাহাকেও মানে না। এমন কি যদি হাঁসপাতালের পরিচ্ছদ-পরা কোন কর্ম্ম-চারীরও আস্তিনের উপর এই চিহ্ন না থাকে তবে কিছুতেই সে তাহার কথা শোনে না। কোন অপ-রিচিত ব্যক্তিও যদি ডাক্তারের পরিচ্ছদ পরিয়া লাল ক্রশের ফিতাটি হাতে বাঁধিয়া আসে তবে সেই কুকুররা তৎক্ষণাৎ তাহার বাধ্য হইবে।

ইহাদের দুই রকম প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। একদলকে এমন করিয়া শেখানো হয় যাহাতে আহত সৈন্য দেখিলে কোন মতে না ডাকে, পাছে চীৎকারে আহত ব্যক্তি ভয় পায় বা সেই দিকে শত্রুর দৃষ্টি পড়ে। এই দলের কুকুর চেষ্টা করে কোন মতে যাহাতে সৈনিকের টুপিটা তাহার মাথা হইতে টানিয়া লইতে পারে। সেই টুপি মুখে লইয়া সে শিবিরে দৌড়াইয়া আসে। তখন হাঁসপাতালের লোকেরা বুঝিতে পারে যে সে এক জন বিপন্ন সৈনিককে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আর এক দল কুকুরকে, আহত সৈন্য দেখিলে এক প্রকার বিশেষ রূপ শব্দ করিয়া সঙ্কেত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার কালে এক জন কেহ আহত সৈনিক রূপে তাঁবু হইতে দূরে কোন এক জায়-গায় লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একটি কুকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে কান খাড়া করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া ঘ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করে তারপর হঠাৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমটা একবার এধারে এক-বার ওধারে যায়, তাহার নাসারন্ধ্র কাঁপিতে থাকে ও চক্ষুতারা বিস্ফারিত হয়। মুহূর্ত্তের জন্য এইরূপ ইত-স্তত করিয়া সে ছুট্‌ দেয় এবং কিছু পরেই দেখা যায় লাল টুপি মুখে লইয়া সে আসিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বাছিয়া লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে সে টুপি রাখিয়া দেয়। ডাক্তার একটি দড়ি বা বেত ধরিয়া থাকেন ও সেইটির অন্ত প্রান্ত মুখে লইয়া কুকুর তাঁহাকে আহত ব্যক্তির নিকট লইয়া যায়।

এই কুকুররা মৃত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ করে না। জীবিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করাই ইহাদের কাজ। ইহাদের পিঠে অনেক সময় পানীয়ের পাত্র চামড়া দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে সে ঐ পানীয় লইবার জন্য কুকুরকে ভুলাইবার যতই চেষ্টা করুক কুকুর কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চায় না। যে ব্যক্তি চলৎশক্তিরহিত ভাবে পড়িয়া না থাকে রক্তক্রস্‌ কুকুররা তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করে না।

পাঞ্জাবের বিবাহ প্রথা। পাঞ্জাবের অধি-কাংশ ব্রাহ্মণ অধিবাসীই সারস্বত শ্রেণীভুক্ত। এই সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নানা শাখা আছে। সেই সকল ভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রচলিত নাই। বাহ্রি নামক ব্রাহ্মণদিগের কেবল ছয়টি মাত্র পরিবারের সহিত চল আছে। বুঞ্জাহি নামক ব্রাহ্মণ-গণের কেবল বাহান্নটি পরিবারের সহিত ক্রিয়াকর্ম্মের যোগ। আঠ্‌বান নামক সারস্বত শাখার ব্রাহ্মণদিগের আটটি উপশাখার নাম উদ্ধৃত হইল ঃ—যোশি, কুরল, সন্দ, পাটক, ভারদ্বাজি, সোরি, তেওয়ারি। ইহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে কিন্তু এই আটপ্রকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের চল নাই। আটটি উপশাখা আছে বলিয়া এই ব্রাহ্মণ-দিগকে আঠ্‌বান বলা হইয়াছে। আঠ্‌বানরা এত অল্প সংখ্যক যে ইহাদের স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

পাঞ্জাবে এইরূপে বিবাহ হয় ঃ—

কন্যার পিতা নাপিতের হাত দিয়া সাতটি খেজুর এবং একটি টাকা পাত্রের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। নাপিতটি বরের বাড়ী পৌঁছিলে পর বরের বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া দ্বারের দুই পাশে তৈল ছিটাইয়া দিয়া নাপি-তকে ভিতরে লইয়া আসে; কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইয়া গেলে গ্রামের পঞ্চায়েৎ ও অন্যান্য লোকেরা একত্র হইয়া বাড়ীর পুরোহিতকে দিয়া ভূমিতলে চতুষ্কোণ আকারে ময়দা ছড়াইয়া তাহার মধ্যে যত গ্রহের নাম লেখে। পুরোহিত যথারীতি বরকে দিয়া গ্রহগুলির পূজা করাইলে পর নাপিত বরের কোলে সেই সাতটি খেজুর ও টাকা রাখে ও বরের কপালে টীকা পরাইয়া দেয়। তখন বরের পিতা সাধ্য অনুসারে নাপিতকে ও পুরোহিতকে টাকাকড়ি দেন ও গ্রামের লোককে মিষ্টান্ন খাওয়ান। পাঞ্জাবীরা এই অনুষ্ঠানকে সগন বলে। বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিলে কন্যা-পক্ষের নাপিতকে দিয়া বরপক্ষের নিকট একটি পত্র পাঠান হয়। সেই পত্রটির নাম সাহ। পঞ্চায়েৎ ও

গ্রামের লোকে একত্র হইয়া এই পত্রটি বরের কোলে অর্পণ করে। এই পত্রে বরের সহিত কত বরযাত্র ও গাড়ী ঘোড়া যাইবে ও কবে বিবাহ হইবে তাহা স্থির করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সাত দিন থাকিতে বরের ও কনের পিতামাতাগণ মাই নামক এক প্রকার বাটনা বর কন্যার গাত্রে মাখাইয়া দেয়। এই বাটনাটি বেসন, তৈল ও মাথাঘষার সংমিশ্রণ। এই নিয়মটি আমাদের গায়েহলুদের মত। বর যখন কন্যার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হয় তখন কন্যাকর্ত্তারা তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইয়া মাথায় টোপর ও কপালে সোনালী জরির ঝালর পরাইয়া দেয়। তাহার পর পণ্ডৎগণ (পণ্ডিতরা) বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া দিলে হোমাগ্নি জ্বালাইয়া আহুতি হয়, ও গ্রন্থিবদ্ধ বর কনেকে চারিবার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পর দিন বরযাত্রীরা কন্যাকর্ত্তার আতিথ্য গ্রহণ করেন, খুব ভোজ ও গান বাজনা হয়। ইহাকে মিঠাভাত বলে এবং তাহার পরের দিনের উৎসবকে খট্টাভাত বলে। অতঃপর কন্যাকর্ত্তারা সাধ্যানুসারে বরযাত্রদিগকে বস্ত্রালঙ্কার ও টাকা কড়ি দিয়া চতুর্থ দিনে বিদায় করে। বিবাহের দু তিন বৎসর পরে বধূকে আনিবার জন্য বর শ্বশুরালয়ে যায়। ইহার নাম মুকলাওয়া, আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে দ্বিরা-গমন। মুকলাওয়ার সময় আবার পুরোহিতকে ডাকাইয়া ময়দার চক্ তৈরি করান হয় ও কন্যাবিদায়ের সময় কন্যাকে যথাসাধ্য অলঙ্কারাদি দেওয়া হয়। বিবাহের সময় বরযাত্রদিগকে ও মুকলাওয়ার সময় কন্যাকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয় তাহার নাম খৎ। কন্যা-পক্ষ হইতে পাত্রের বাড়ী বিবাহপ্রস্তাব পাঠাইবার সময় চারিটি প্রশ্ন করা হয়—"পাত্রটি কোন্ গোত্রের? পাত্রের পিতা মাতার আত্মীয়েরা কোন্ গোত্রের? পাত্রের মাতা কোন গোত্রের? এবং তাহার মাতামহীর কোন্ গোত্র?" এই চারিটি গোত্রের কোনটি যদি কন্যার গোত্রের সহিত এক হয় তবে বিবাহ হয় না।

শ্রীঅতসী দেবী।

চরিতার্থ।

এতদিন, প্রিয়তম, হৃদয় আমার
চঞ্চল মধুপসম শুধু বারম্বার
এসেছে গিয়েছে ফিরে, মরেছে ঘুরিয়া।
সহসা পেয়েছে খুঁজে ব্যাকুল সে হিয়া
একটি গোপন ঠাঁই মর্ম্মের নিভৃতে।
ঘুচিল ব্যর্থতা তার; আজি এক ভিতে
পুঞ্জীভূত মকরন্দে আনন্দে নীরবে
রচি মধুচক্রখানি চরিতার্থ হবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প

প্রথম ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৬ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদান্তবাদ।

দ্বিতীয় প্রপাঠক।

পরিচয়।

প্রথম প্রপাঠকে প্রাচীন তিন খানি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের কথা তুলিয়াছিলাম। আজ তাহা হইতেই আরম্ভ করা যাউক। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেরূপ ভাষ্য এ পর্য্যন্ত আর বিরচিত হয় নাই। তাঁহার ভাষ্যের প্রসন্ন গম্ভীর ভাব অতিরমণীয়। তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনের কৌশল ও রচনারীতি অতিপ্রশংসনীয়। এরূপ ভাব অন্য কোনো ভাষ্যেই দেখা যায় না। শাঙ্কর ভাষ্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল, রামানুজের ভাষ্য সেরূপ নহে। রচনারীতির সম্বন্ধে সমস্ত ভাষ্যের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যের স্থান যে প্রথম, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে পতঞ্জলির ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের রচনা শাঙ্কর ভাষ্যের রচনা অপেক্ষাও ভাল বলিয়া বোধ হয়।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সমূহে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আর যত ভাষ্যই হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সর্ব্ববিষয়ে শাঙ্কর ভাষ্যের প্রভাবেই পরিপুষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদিও ঐ সকল ভাষ্য শঙ্করের মতকে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া শঙ্করের ভাষ্যকেও বেদান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়, এবং উপনিষদের তুল্যই তাহা সম্মানিত হইয়া থাকে। শিষ্টাচারানুযায়ী বেদান্তাচার্য্যগণ শিষ্যবৃন্দকে যেরূপ পবিত্র ভাবে উপনিষৎ অধ্যাপন করিয়া থাকেন, শাঙ্কর ভাষ্যকেও সেইরূপে অধ্যাপন করেন। বেদান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় অন্যান্য গ্রন্থকেও বেদান্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকে শা রী র ক মী মাং সা বলিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্য শ্রী ভা ষ্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তাহা শা রী র ক মী মাং সা নামে কথিত হইয়া থাকে। শা রী র ক নামটি শঙ্করাচার্য্যের নিজের উদ্ভাবিত নহে। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন বৃত্তিকার উ প ব র্ষ কে ঐ অর্থেই এই শা রী র ক শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই।

বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকারগণ তাহার অর্থ এইরূপ করেনঃ—জীব শরীরে বাস করে বলিয়া তাহার নাম শা রী র ক, তাহার মীমাংসা অর্থাৎ পরমাত্ম-রূপতারূপ বিচার বলিয়া সেই ভাষ্যের নাম শা রী র ক মী মাং সা। কিন্তু রামানুজমতাবলম্বিগণ ইহার অন্য প্রকার অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন—শরীরসম্বন্ধী শা রী র, অর্থাৎ জগদ্রূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেই শা রী র পরমাত্মা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহার নাম শা রী র ক।

শঙ্করাচার্য্যের এই শারীরকমীমাংসাভাষ্যের অনেকগুলি টীকা আছে। আবার সেই সব টীকারও টীকা-অনুটীকা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের একটির ধারা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে:—প্রথমত ব্রহ্মসূত্র, তাহার পর শাঙ্কর-ভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী, ভামতীর টীকা বেদান্তকল্পতরু, বেদান্তকল্পতরুর টীকা অপ্পয়-দীক্ষিতকৃত বেদান্তকল্পতরুপরিমল, এবং শুনিয়াছি, ইহার টীকার নাম আভোগ, ও আভোগেরও টীকার নাম ভ্রমর।

আভোগ ও ভ্রমর দেখি নাই, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই আজকাল সুলভ।

শঙ্করাচার্য্য স্বভাষ্যে অ দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য তিনি কেবল ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, কেননা, কেবল ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা করিলে ঐ মত প্রতিষ্ঠিতই হইতে পারে না; ব্রহ্মসূত্রের মূলস্বরূপ উপনিষদ্গুলি এবং সর্ব্বোপনিষদের সারভূত ভগবদ্গীতাকেও তন্নিমিত্ত ঐরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই জন্য তিনি প্রধান প্রধান দশ খানি উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকেও অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের পরে বেদান্তমূলক যে-কোন প্রধান সম্প্রদায় অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়কেই উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিন গ্রন্থকে স্ব স্ব মতে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

এই তিন গ্রন্থকে প্র স্থা ন ত্র য় বলা হয়, এবং পৃথক্ পৃথক্-ভাবে যথাক্রমে শ্রু তি প্র স্থা ন, স্মৃ তি প্র স্থা ন, ও সূ ত্র প্র স্থা ন উক্ত হইয়া থাকে। উপনিষৎসমূহ শ্রুতি বলিয়া তাহার নাম শ্রু তি প্র স্থা ন। ভগবদ্গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, মহাভাবতকে স্মৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়, শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় ভাষ্যের বহু স্থলে মহাভারতের বাক্য স্মৃতি নামেই উদ্ধৃত করিয়াছেন; অন্যান্য আচার্য্যগণও এইরূপ করিয়াছেন। মহাভারত স্মৃতি বলিয়া তদন্তর্গত ভগবদ্গীতাও স্মৃতি, এবং সেই জন্যই তাহার নাম স্মৃ তি প্র স্থা ন। ব্রহ্মসূত্র সূত্রাত্মক বলিয়া তাহার নাম সূ ত্র প্র স্থা ন। প্রস্থান শব্দের অর্থ প্রয়াণ অর্থাৎ গতি; বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বলিলে এই বুঝিতে হয় যে, বেদান্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র এই তিন গতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনে বেদান্ততত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য অ দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়াছেন উক্ত হইয়াছে। এখন এই অ দ্বৈ ত এবং তাহার মূল দ্বৈ ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি, একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা আবশ্যক। পণ্ডিতগণ ইহার দুইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বিতা (অর্থাৎ দ্বিত্ব) এবং দ্বৈত শব্দ অর্থত একই; দ্বৈ ত শব্দের অর্থ ভেদ, অতএব অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ অভেদ। এই ব্যাখ্যাই সাধারণত প্রসিদ্ধ। অন্য কেহ কেহ বলেন—দ্বী ত শব্দের অর্থ দ্বিধাজ্ঞান, দ্বী ত এবং দ্বৈ ত শব্দ অর্থত একই, অতএব দ্বৈত শব্দেরও অর্থ দ্বিধা জ্ঞান; এবং তাহা হইলেই অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ একবিধ জ্ঞান, অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই উভয় নির্ব্বচনই ফলত একই কথা প্রকাশ করিতেছে; উভয় নির্ব্বচনেই অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ অভেদ পাওয়া যাইতেছে।

তাহা হইলেই শঙ্করের অ দ্বৈ ত বা দে র অর্থ অভেদবাদ। শঙ্কর বলেন যে, জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ। সমস্ত বেদান্তে তিনি ইহাই স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থত কোন সত্তা নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রম, বা শুক্তিতে রজতভ্রম হইলে যেমন সেই-সেই স্থলে পরমার্থত সর্প বা রজত না থাকিলেও তাহাদের প্রতীতি হয়, এবং সত্য সর্প ও সত্য রজত দর্শন করিলে যেমন ভয় বা প্রীতির উদ্রেক হয়, ভ্রম স্থলেও সেইরূপই থাকে; এবং যখন সেই রজ্জু বা শুক্তিকে চিনিতে পারা যায়, তখন যেমন সর্প বা রজত আর প্রতিভাসিত হয় না,* সেখানে কেবল রজ্জু বা শুক্তিই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মেই অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই আর তাহা প্রতীয়মান হইবে না। এখন যাহ দেখা যাইতেছে, তাহা সমস্তই ভ্রম। এই ভ্রমেরই নাম মায়া, বা অবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলেই এই অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য এই সমস্ত জগৎ নিবৃত্ত হইবে। স্বপ্নদর্শন-স্থলে যেমন এক স্বপ্নদ্রষ্টাই সত্য, আর লোক-জন ইত্যাদি যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সমস্তই মিথ্যা, ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। স্বপ্নের পর জাগ্রদ্ অবস্থা আসিলে যেমন স্বপ্নকার্য্য আর কিছুই থাকে না, সমস্ত বিলীন হইয়া যায়, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলেও সেই রূপ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন সত্তা থাকিবে না, তখন ঐ এক দ্রষ্টা আত্মা বা জীবই সত্য থাকিবে, এবং এই জীব ও ব্রহ্ম একই।

শঙ্করাচার্য্যের মতকে অনেক সময় বি ব র্ত্ত বা দ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যেখানে কার্য্য ও কারণ একরূপ, অর্থাৎ কারণ নিজের তত্ত্ব বা স্বরূপ বা লক্ষণ পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে ঐ কার্য্যকে পরিণাম, বা বিকার বলা হয়; যথা, কুণ্ডল সুবর্ণের পরিণাম, বা বিকার। আর যেখানে কারণ একরূপ, এবং কার্য্যও আর একরূপ, অর্থাৎ কারণের তত্ত্ব বা স্বরূপ কার্য্যে অনুগত হয় না, অথচ তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে ঐ কার্য্যের নাম বিবর্ত্ত; যথা, শুক্তিরজত-স্থলে রজত শুক্তির বিবর্ত্ত, রজ্জুসর্প-স্থলে সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত। শঙ্কর বলেন যে, এই দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের সেইরূপ বিবর্ত্ত। এবং সেই জন্যই তাঁহার মতকে বি ব র্ত্ত বা দ বলা হয়।

শুক্তিরজত-স্থলে যে রজত দেখা যায়, তাহাকে সৎ পদার্থ বলা যায় না, কেননা, সৎ পদার্থের কখনো ধ্বংস হয় না; কিন্তু শুক্তি-রজত-স্থলে ঐ রজতের ধ্বংস আছে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিতে পারিলেই আর সেখানে রজত দেখা যায় না। অতএব ঐ রজত সৎ নহে।

আবার তাহা অসৎও নহে; কেননা, অসৎ হইলে তাহার কোনোরূপ প্রতীতিই হইতে পারে না। অসৎ অলীক বস্তুর প্রতীতি কখনো সম্ভাবিত নহে; বন্ধ্যা-পুত্র, শশশৃঙ্গ কূর্ম্মলোম বা আকাশকুসুমবৎ অলীক, এবং সেই জন্যই তাহাদের প্রতীতি নাই। কিন্তু শুক্তি-রজত সেরূপ নহে, শুক্তিরজতের প্রতীতি আছে, তাহাকে আমরা দেখিতে পাই। সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাকে সদসৎও বলিতে পারা যায় না। অতএব বস্তুত শুক্তিরজত কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তাহার নির্ব্বচন করিতে পারা যায় না, অতএব তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলাই উচিত। শঙ্করের মতে যাহার প্রভাবে এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে, সেই সকল অনর্থ-হেতু অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ উভয়েই পূর্ব্ববর্ণিত শুক্তি-রজতের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়, এবং সেই জন্যই তাঁহার মতের আর একটি নাম অনির্ব্বচনীয়বাদ বা অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি।

শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে অথবা অষ্টম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট খাঁটি জানা যায় নাই; কেহ আবার বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুদয় বলিতে চান। যাহাই হউক, তাঁহার পরে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া বেদান্ত আলোচনা নব ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের নব-নব ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল। বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়া শঙ্করাচার্য্য যেমন এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও সেইরূপ স্ব-স্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এবং এখনো তাহা চলিয়া আসিতেছে। কোনো মত উদ্ভাবন করিয়া সাধারণ জনসমাজকে তাহার অনুসরণ করাইতে হইলে কতদূর যোগ্যতার আবশ্যক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়। তাহার উপর আবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে ঐ কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য। শঙ্করের পরবর্ত্তী উল্লিখিত ব্যাখ্যাকারগণও সেইরূপ যোগ্যতা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই শঙ্করের ন্যায় তাঁহারাও আচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম, যথা, রামানুজ, আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিয়মানন্দ বা নিম্বার্ক। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। মূলত ইঁহাদের দ্বারাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইঁহার ভাষ্যও শারীরক মীমাংসা ভাষ্য নামে কথিত হয়; তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি নাম শ্রীভাষ্য। তাঁহার উদ্ভাবিত মত শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা পরিগৃহীত বলিয়া ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য হইয়াছে, এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়। ইনি ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ বোধায়ন-কৃত যে বিস্তীর্ণ বৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তন্মতানুসারেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* রামানুজ স্বভাষ্যে শঙ্করের মতকে যতদূর পারিয়াছেন খণ্ডন করিতে ত্রুটি করেন নাই; এবং তাঁহার যুক্তিবলও সাধারণ নহে।

তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপঃ—বিশিষ্টের অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত; অথবা বিশিষ্ট অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত। চিৎ অর্থাৎ চেতন, অচিৎ অর্থাৎ জড়, এবং ব্রহ্ম, এই তিনটি পদার্থ মূলত স্বীকার করিয়া ইঁহারা বলেন যে, ঐ চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম শরীরিস্বরূপ। এই চিদচিন্ময় জগৎপ্রপঞ্চরূপ শরীরের ব্রহ্ম আত্মা, ব্রহ্ম ঐ চিৎ ও অচিৎ এই উভয়-বিশিষ্ট, এবং সেই চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বৈত অর্থাৎ একত্ব এই মতে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অথবা তাদৃশ চিদচিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈত অর্থাৎ এক বলিয়াও এই মতের ঐ নাম হইতে পারে। শরীর ও শরীরীর (জীবাত্মার) ভেদ থাকিলেও যেমন সেই শরীরবিশিষ্ট শরীরীর "এই ব্যক্তি এক" এইরূপে ঐক্য ব্যবহার হইয়া থাকে; সেইরূপ চিৎ ও অচিতের সহিত ব্রহ্মের বস্তুত ভেদ থাকিলেও, সেই চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক। শঙ্কর-মতে যেমন এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকেই মিথ্যা বলা হয়, রামানুজ মতে সেরূপ নহে; ইহাতে সমস্তকেই সত্য বলিয়া স্বীকার হয়।

রামানুজের ন্যায় আরো এক জন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য আছেন। ইঁহার নাম শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য ভাষ্যকারের নামে শ্রীকণ্ঠভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকে শৈবভাষ্যও বলা হয়, কেননা, এই ভাষ্যে ব্রহ্ম শিব নামেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। এই ভাষ্যের রচনা বেশ প্রাঞ্জল, যুক্তিও মনোরম। এবং ইহার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো ভাষ্যেরই কোনো কথা উদ্ধৃত হয় নাই, অথবা খণ্ডিত বা সমর্থিত হয় নাই। তবে ভাষ্যকার গ্রন্থপ্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, বিদ্বদ্‌গণের ব্রহ্মসিদ্ধির নেত্রস্বরূপ ব্রহ্ম-সূত্রকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি তাহা নির্ম্মল করিতেছেন। শৈবাগমের এই ভাষ্যই পরম প্রামাণিক ও আশ্রয়স্থল। শ্রীকণ্ঠও রামানুজের ন্যায় চিদচিতের সহিত ব্রহ্মের শরীরশরীরিভাব সম্বন্ধ গ্রহণ

করিয়াছেন। মূল প্রক্রিয়ার সহিত ইঁহাদের উভয়ের পার্থক্য নাই ; শ্রীকণ্ঠও শিবরূপ ব্রহ্মকে চিদচিদ্বিশিষ্ট ও অদ্বৈত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহার মতকে ইঁহার নামানুসারে কখনো কখনো আ ন ন্দ তী র্থী য়, বা মা ধ্ব মত বলা হয়। মূল মাধ্বভাষ্য সংক্ষিপ্ত। যুক্তির দৃঢ়তা বা রচনাবন্ধনে ইহা শাঙ্কর বা রামানুজভাষ্যের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়া ইনি যে দর্শন প্রচলিত করিয়াছেন তাহা পূ র্ণ প্র জ্ঞ দ র্শ ন নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অ ভে দ স্বীকার করেন বলিয়া তাহার মতকে যেমন অ দ্বৈ ত বা দ বলা হয়, মধ্বাচার্য্যও সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার বলেন বলিয়া তাঁহার মতকে দ্বৈ ত বা দ বলা হয়। কথিত আছে মধ্বাচার্য্যের মত চতুর্ম্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মার সম্মত ; এই জন্য তাঁহার সম্প্রদায়কে চা তু র্ম্ম খ স ম্প্র দা য় বলা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতএব মাধ্বসম্প্রদায়ের ন্যায় তিনিও দ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং ব্রহ্মসূত্রেব মাধ্বভাষ্য-কেই অবলম্বন করিয়া চলিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতেই তাঁহার সমাধক অনুরাগ ছিল। শ্রীমদ্ভাগ-বতের তুলনায় তাঁহার নিকটে মাধ্বভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের অর্থসম্বন্ধে যেথানে যেথানে অসামঞ্জস্য বোধ হইত, সেই সকল স্থানকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিতেন ; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পৃথক্ কোন ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেই মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া পরমপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গো বি ন্দ ভা ষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা রচনা করেন। মূলত তিনি মধ্বাচার্য্যকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, এবং তাঁহার মতই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই গোবিন্দভাষ্যই উপজীব্য। মাধ্বভাষ্য অপেক্ষা গোবিন্দভাষ্য যুক্তি, তর্ক, রচনা সব বিষয়েই উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

নিয়মানন্দ বা নিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈ তা দ্বৈ ত, বা অপর কথায় ভে দা ভে দ বা দ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের অভি-নব ব্যাখ্যা রচনা করেন। অভিজ্ঞগণ বলেন যে, নিম্বার্ক ঔড়ুলোমি-কৃত প্রাচীন ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই নিজ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যার নাম বে দা ন্ত পা রি জা ত সৌ র ভ। ইহা অতি-সংক্ষিপ্ত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অন্যান্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কথা ঐ দর্শন আলোচনা করিবার সময় বলিব। রামা-নুজের ন্যায় এই মতেও চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। ইঁহারা বলেন যে, এই চিদচিন্ময় জগৎপ্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্ম ভি ন্ন এবং অ ভি ন্ন উভয়ই, অপর কথায় জীবজড়ময় জগতের ব্রহ্মে ভে দ ও অ ভে দ উভয়ই রহিয়াছে ; এবং এই ভে দ ও অ ভে দ স্বাভাবিক। জড় ও জীব উভয়েই ব্রহ্মের শক্তি। প্রলয়কালে এই জড়জীবময় জগৎ অতিসূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ভাবে ব্রহ্মেই থাকে, ব্রহ্ম নিজের সেই শক্তিকে তখন সঙ্কুচিত করিয়া লন, এবং সৃষ্টির সময় আবার তাহার প্রসারণ করেন। সর্প ও তাহার কুণ্ডল এই উভয়ের অথবা সূর্য্য ও তাহার প্রকাশের পরস্পর যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক, ব্রহ্ম ও জগতে সেইরূপ। এই জন্যই নিম্বার্কের মতকে স্বা ভা বি ক দ্বৈ তা দ্বৈ ত, বা ভে দা ভে দ বা দ বলা হইয়া থাকে। নিম্বার্ক এই অভিনব মত প্রকাশ করিয়া যে সম্প্রদায় প্রচলিত করেন, তাহা চ তুঃ স ন স ম্প্র দা য় বলিয়া খ্যাত।

নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য্যও দ্বৈ তা দ্বৈ ত বা দী। কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিম্বার্ক উক্ত ভেদাভেদকে স্বা ভা বি ক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাহা ঔ পা ধি ক (attributive) বলিয়া প্রতিপাদন করেন। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা গ্রন্থকারের নামে ভা স্ক র ভা ষ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং যুক্তিতর্কাদির দ্বারা বেশ পরি-পুষ্ট। ভাস্কর-ভাষ্য এখনো সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই, আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাই-য়াছি। এবং ইহার দ্বারাই তাঁহার মত সংগ্রহ করিতে পারা যায়, কেননা, প্রথম চারিটি সূত্রের মধ্যেই ভাষ্য-কারগণ স্ব-স্ব মতামত প্রধানত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আচার্য্য বি ষ্ণু স্বা মী শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চের সমাধানের জন্য তাঁহাকে সেই অদ্বৈতে মায়ার সম্বন্ধ বলিতে হয়। কিন্তু বিষ্ণুস্বামী তাহা বলেন না, তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত অদ্বৈত স্বীকার করেন, এই জন্য তাঁহার মতের নাম শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ। ইনি বলেন, যাহা কিছু জড়-চেতন দেখা যাইতেছে, তাহা এক অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। অদ্বৈত ব্রহ্ম সদ্-রূপে, চিদ্-রূপে ও আনন্দ রূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। তবে সর্ব্বত্র সমস্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন না, স্থান বিশেষে তাঁহার কোন কোন অংশ তিরোভূত এবং কোন কোন অংশ আবির্ভূত থাকে। সামান্য জড় তৃণেও তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন, তবে সেখানে তাঁহার কেবল সদ্-রূপ মাত্র আবির্ভূত বা প্রকাশিত আছে, আর

চিৎ ও আনন্দ-রূপ তিরোভূত রহিয়াছে। চেতনে তাঁহার সদ্‌-রূপ ও চিদ্‌রূপ উভয়ই প্রকাশিত রহিয়াছে, আনন্দরূপ তিরোভূত আছে। অন্যত্রও এই আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমস্ত বুঝিতে হইবে। এইরূপে এক শুদ্ধ অদ্বৈত স্বীকার করায়, এই মতের নাম শুদ্ধাদ্বৈত। অথবা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত যে জগদ্‌রূপ কার্য্য ও তাহার কারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম, এই উভয়ের অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ স্বীকৃত হয় বলিয়াও ঐ মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা চলে।

বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার মত রুদ্রের সম্মত বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ের নাম তদনুসারে রুদ্র সম্প্রদায় নামে খ্যাত, ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের কোনো ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। কথিত আছে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর কিছু দিন পরেই তাঁহার সম্প্রদায় একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তাহার পরেই বল্লভাচার্য্য তাহাকে পুনর্ব্বার জাগাইয়া তোলেন। বল্লভাচার্য্যই তখন সেই সম্প্রদায়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, এবং তাঁহার মতেই সম্প্রদায়ের নাম বল্লভ সম্প্রদায় হইল। এই সম্প্রদায়কে পুষ্টিমার্গীয় নামেও অভিহিত করা হয়। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-আলোচনার সময় বলিলে ভাল হইবে বলিয়া এখানে আর বলিতেছি না। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পরিগৃহীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য। ইহা বল্লভাচার্য্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ভাষ্য-খানি আকারে ছোট নহে, অতএব তজ্জন্য তাহার নাম অণু হয় নাই। শঙ্করপ্রভৃতি যেমন জীববাচী শারীরক শব্দ স্বস্ব ভাষ্যের নাম করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, অন্যান্য বৈষ্ণব দর্শনের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈতদর্শনেও জীবের পরিমাণ অণুমাত্র স্বীকৃত হওয়ায় অণু শব্দে এখানে জীবকেই লক্ষিত করা হইয়াছে, এবং এইরূপে জীববাচী অণু শব্দেই ভাষ্যের নামকরণ হইয়াছে। রামানুজের ন্যায় বল্লভও শঙ্করের মতকে অবসর পাইয়াই খণ্ডন করিতে নিবৃত্ত হন নাই। ইনি স্বকীয় ভাষ্যে স্থানে স্থানে শঙ্করকে সর্ব্ববিপ্লববাদী প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি মাধ্যমিক নামে শূন্যবাদী বৌদ্ধের অপর অবতার, এবং এই জন্যই সজ্জনগণের উপেক্ষণীয়।

সাঙ্খ্যদর্শনের সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর নাম দার্শনিকগণের নিকট সুপরিচিত। ইনিও বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যের নাম বিজ্ঞানামৃতভাষ্য। সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যের ন্যায় বিজ্ঞানামৃতভাষ্যেও বিজ্ঞানভিক্ষু অন্যান্য দর্শনের মতকে যতদূর পারিয়াছেন, সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যপ্রবচনের ন্যায় বিজ্ঞানামৃতেও তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতকে ভূয়োভূয়ঃ খণ্ডিত করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুকে একরূপ ভেদাভেদবাদী বলিতে পারা যায়, কিন্তু ইঁহার ভেদাভেদ নিম্বার্কের বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় নহে। ইনি বলেন জীব হইতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, শঙ্করাচার্য্যের মত ঐ দুই পদার্থের অত্যন্ত অভেদ বা ঐক্য নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ আছে, কিন্তু এই অভেদ অর্থে ইহা নহে যে, তাহাদের পরস্পরের স্বরূপত কোনো ভেদ নাই; ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির আদি ও অন্তে এই জীব ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হইয়া থাকে, লবণ ও জল যেমন পরস্পর অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম ও জীবও সেইরূপ অবিভক্ত থাকে। কেবল জীবই যে এইরূপ ভাবে থাকে তাহা নহে, অন্যান্য সমগ্র জড় পদার্থই এইরূপ অবিভক্ত থাকে, এবং সেই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "এই সমস্তই আত্মা।" এতাদৃশ স্থানে জড় পদার্থের সহিত ব্রহ্মের এই অভেদকে যেমন অবিভাগরূপে অভেদ বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না, কারণ, তাহা না হইলে জড়ের সহিত অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মও জড় হইয়া পড়েন, সেইরূপ জীবের সহিতও ব্রহ্মের অবিভাগরূপই অভেদ গ্রহণ করিতে হয়। বেদান্তশাস্ত্রের মহাবাক্যসমূহ ব্রহ্মাত্মতা প্রতিপাদন করে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন, তবে তাহার তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মই জীবের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্ম জীবের আত্মা হইলেও জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেন না, শরীরের যেমন এক পৃথক্ আত্মা চেতন রহিয়াছে, জীবেরও সেইরূপ ব্রহ্মই আত্মা। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই মুখ্য আত্মা, জীব গৌণ আত্মা। যখন বিজ্ঞানভিক্ষুর এই বিজ্ঞানামৃতভাষ্যকে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা হইবে, তখনই এই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার রূপে বলিব বলিয়া এখন এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতেছি না।

বেদান্তদর্শনের আর একখানি ভাষ্যের নাম নিরঞ্জন ভাষ্য। এই ভাষ্যকারের নাম বিশদেবাচার্য্য। ভাষ্যখানি পুণা-আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইলেও এখনো আমাদের হস্তগত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথাই আজ আমি বলিতে পারিলাম না, আশা করি অনতিবিলম্বেই বলিতে পারিব।

এতো ছাড়া পূর্ব্বোক্ত সব মতেই বেদান্তদর্শনের আরো একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৃত্তির মধ্যে, এবং কতকগুলিকে ভাষ্য বলিয়াই গণ্য করা হয়। এই সমস্ত বিবরণ এখানে না বলিয়া বিশেষ বিশেষ শাখা বা সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনার সময়েই বলিব।

বেদান্তদর্শনের যে সকল শাখার কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে যে-গুলিকে এখনো সেরূপ আলোচিত হইতে দেখা যায় না, আমি সেই গুলি লইয়াই প্রথমে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব; এবং প্রত্যেক দর্শনের কথাই সাধারণত দুই-দুইটি প্রপাঠকে যথাশক্তি সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা তদনুসারে পরবর্ত্তী প্রপাঠকে নিম্বার্কদর্শন আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ তবে আপনাদের নিকটে বেদান্তের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করি।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

বর্ষা আবাহন।

বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে
এসহে নিবিড় এসহে!
হৃদয় ভরানো জীবন জুড়ানো
এস সুগভীর এসহে।
এস পবিত্র, এস নিরমল,
এস তাপহর, এস সুশীতল,
অশনিমন্দ্রে এস মহাবল,
ঘোর গম্ভীর এসহে।
তৃষিত শুষ্ক তপ্ত ধূলায়
পরাণ বরষি এসহে।
বিদ্যুৎ জ্বালা চকিতে জ্বালায়ে
ভীষণ হরষে এসহে।
এস ঝর ঝর সজলছন্দে,
এস ধরণীর আর্দ্র গন্ধে
এস নব-ঘন ঘন আনন্দে
পুলক-অধীর এসহে॥

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা।*

কর্ম্ম করতে করতে কর্ম্মসূত্রে এক এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে,—তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে খুলতে সেরে নিতে চারদিকে কত রকমের টানা-টানি করতে হয়—তাতে মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল—তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে, এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কি করলে জটা ছাড়ানো হবে, অকল্যাণ দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর পশ্চিমে ঘন ঘোর মেঘ করে এসে সূর্য্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মত ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্ত ভাবে ছুটে আসচে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল; তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্ম্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘন ধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে-থেকে মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারিদিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে সে জন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম, মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারিদিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়—চিন্তা করে নয় চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্য্যাপ্ত বর্ষণ এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারি ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে' দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা একমুহূর্ত্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ করে', একটুর সঙ্গে আরেক-টুকে জুড়ে গেঁথে কোনোকালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু জমা নয়, সে কল্পের এক নিশ্বাসে বনে

* ৬ই বৈশাখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিগূঢ় মর্ম্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করচে—যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে' অকস্মাৎ সে কি আশ্চর্য্যরূপে দেখা দেয়! বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্ত্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে একমুহূর্ত্তে শ্যামল করে তোলে—তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখ্‌তেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কি বাধাহীন, কি প্রচুর, কি মধুর, কি গম্ভীর সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করচে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই—কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বল্‌চে না; কেবল ইচ্ছা করচে বিশ্বজগতের মধ্যে যে একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখবিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারচে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই—তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে, সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাক্‌বে—যে দীনতা কোনো দিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নাম্‌বে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাক্‌বে তোমার প্রসাদধারা—গহ্বর যত, গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠ্‌চে। বারিধারা ঝরচে ঝরচে—সমস্ত ধুয়ে যাচ্চে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্চে, সমস্ত নবীন হয়ে উঠ্‌চে, শ্যামল হয়ে উঠ্‌চে। বাইরে কেউ দেখ্‌তে পাচ্চে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার—তারি মধ্যে নেমে আস্‌চে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি; ভরে ভরে নিয়ে আসচে তাঁরি সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই—এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে; তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কি গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব; সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে;—প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎসুক হয়ে উঠেছে—তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারিদিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুসির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুসি হও! এই সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুসি, এই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুসি—সেই খুসির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মনপ্রাণশরীর আজ খুসি হয়ে উঠুক্! আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্ম্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক্—পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এস, এস, তুমি এস,—আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এস! হে গোপন, তুমি এস! প্রান্তরের এই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এস! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এস, আজ তুমি বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও—তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন; তাহা এই যে, শরীর কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে, বার্দ্ধক্য হইতে মৃত্যুতে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে—ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী যিনি আত্মা তিনি প্রকৃতির কোনো পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না। কিন্তু আত্মা স্থির আছেন জানিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে ঘুরিতে বিভ্রান্ত হইতে না দিয়া তোমাকে করিতে হইবে কর্ম্মের পর্ব্বত-আরোহণ;—তাহার শিখরে যখন উত্থান করিবে তখন তোমার অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞান এবং আনন্দ পরিষ্কাররূপে দীপ্তি পাইবে। তুমি চক্ষুষ্মান্‌ই হও, আর অন্ধই হও, তোমাকে গন্তব্য পথ অতিবাহন করিতেই হইবে। তুমি যদি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও পথ দেখিয়া না চলিয়া ক্রমাগতই খানায় ডোবায় পা-পিছ্‌লিয়া পড়িয়া যাইতে থাক', তাহা হইলে তোমার চক্ষু থাকা না-থাকা সমান। তুমি যদি ইংরাজি ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও একটা ইংরাজি কহিতে

দশটা ব্যাকরণ ভুল কর তবে সেরূপ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা মূর্খত্ব ভাল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কর্ম্মের পার্ব্বত্য-পথের যাত্রীদিগের পক্ষে যাহা একান্ত পক্ষে অবলম্বনীয় এইরূপ একটি আশ্রয়-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে আশ্রয়-দণ্ড হ'চ্চে অবিচলিত্তভাবে আত্মাতে স্থিতি—যাহার আর এক নাম যোগ। পাতঞ্জল-দর্শনে যোগশব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ :—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং।"

যোগ কি? না চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তাহাতে ফল হয় কি? না, স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ আত্মা ঠিক্ আপনি যাহা তাহাতেই ভর করিয়া দাঁড়ানো। ভাব এই যে, অসংযত মন ক্রমাগতই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, একদণ্ডও স্থির থাকে না; জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে স্থির করা চাই। কচ্ছপ যেমন আপনার বহির্মুখী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয়া লয়, সেইরূপ বহির্মুখী মনোবৃত্তিসকলকে ভিতরে টানিয়া লইয়া আত্মাতে সমাহিত করা চাই। এই জায়গাটিতে গোড়াতেই এই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উত্থিত হয় যে, জ্ঞান নানাপ্রকার—যেমন সঙ্গীত-বিজ্ঞান জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানিলাম যে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে গীতের স্বরলহরীর প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; জ্যোতিষ-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদির গতিবিধির প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; রসায়ন-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে দ্রব্যাদির সংযোগ-বিয়োগ-মূলক রূপান্তর সংঘটনের প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; এইরূপে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের চরিতার্থতা সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ বিষয়-ক্ষেত্রে মন স্থির করা আবশ্যক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি বিষয়-বিশেষে মন স্থির করিতে বলিতেছ না—তুমি বলিতেছ আত্মাতে মনস্থির করিতে; ইহার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর:—মনে কর তুমি তানসেনের নিকটে বেহাগ-রাগিণীর একটি গান শিক্ষা করিতেছ, আর মনে কর যে, সেই গানটির সমের জায়গার সুরটি নিরন্তর তোমার মনঃকর্ণে বাজিতেছে — উহার আর কোনো সুরের প্রতি তোমার তেমন মন বসিতেছে না; এরূপ হইলে, বেহাগ-রাগিণী গাহিতে শেখা যে, তোমার ভাগ্যে কোনো কালে ঘটিয়া উঠিবে তাহার কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। তুমি যদি বেহাগ-রাগিণীর গান গাহিবার সামর্থ্য উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর] তবে বেহাগ-রাগিণীর গীতের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বেহাগ-রাগিণীর মুখ্যভাবটি চুনিয়া লইয়া তাহারই প্রতি মনঃসমাধা করা তোমার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। সা গা মা পা নি এই পাঁচটি সুর যেমন বেহাগ-রাগিণীর অন্তর্ভূক্ত, তেমনি সমস্ত বিজ্ঞান মোট জ্ঞানের অন্তর্ভূত। একদিকে যেমন দীপালোকিত ঘরের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দ্রব্যাদি দীপনির্গত ভিন্ন-ভিন্ন রশ্মিছটার আলোকে প্রকাশিত হয়, এবং আর-একদিকে যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট দীপ-রশ্মি আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত; সেইরূপ একদিকে জ্যোতিষাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা-তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের অর্থাৎ ফ্যাক্ড়া-জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়, আর একদিকে আত্মার সঙ্গাশ্রিত মোট জ্ঞান আপনাতে আপনি প্রকাশিত। আত্মার সঙ্গাশ্রিত সেই যে জ্ঞান যাহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত তাহারই নাম আত্মজ্ঞান—আত্মজ্ঞানই মোট জ্ঞান। দীপের সমস্ত ফ্যাকড়া রশ্মিজাল যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট রশ্মির অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত ফ্যাকড়াজ্ঞান বা বিজ্ঞান আত্মাশ্রিত মোট জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত। উপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে,—

"অপরা ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।

অর্থাৎ অপরাপর বিদ্যা অপরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। যেমন বেহাগের গীত গাহিবার সময় সেই রাগিণীর মুখ্য ভাবটির মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি অনুসারে স্বর-সপ্তকে বিচরণ করিতে হয়; তেমনি জ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে আত্মার মুখ্যতম জ্ঞান এবং আনন্দে দৃঢ়রূপে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিধেয়। কেননা, তাহা হইলেই কর্ম্মধন্দার প্রতিযোগে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বাধীন স্ফূর্ত্তি এবং সদানন্দ অনুপম সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্যের উপদেশ দিয়া তাহার পরে যোগের উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন; "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক বই দুই নহে কুরুনন্দন, পরন্তু অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা এবং অনন্ত।" এই কথাটির একটি উপমা দিতেছি তাহার আলোকে উহার তাৎপর্য্য শ্রোতৃগণের চক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইবে।

মনে কর যে, দেশের রাজা দূত-মুখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক্ বেলা

দশটার সময় তুমি রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে চাও, এক মুহূর্ত্তও যেন বিলম্ব না হয়; আর, মনে কর, রাজসভায় যাইবার জন্য তুমি সাজিয়া বাহির হইয়াছ, ইতিমধ্যে তোমার দুই বয়স্য রাজদর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার সঙ্গে যুটিলেন। মনে কর, রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত ডানদিক্ দিয়া তিনটি শানবাঁধা বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে, আর, বামদিক্ দিয়া ঐরূপ আর-তিনটি বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গী-দুজনা'র মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতে আরম্ভ হইল। রাম বাবু বলিলেন, বাম দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; শ্যাম বাবু বলিলেন, দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; এ তর্কের আর কিছুতেই মীমাংসা হইতে'ছনা; এদিকে সময় যাইতেছে; তোমাকে ঠিক দশটার সময়ে রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে হইবে;—তুমি বলিলে, "তোমরা বলিতেছ নানা কথা—ঘড়ি কি বলে দেখি"; ঘড়ি বলিল, "৯টা বাজিয়া পঞ্চাশ মিনিট্"। তুমি বলিলে "সর্ব্বনাশ!" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তুমি সম্মুখের সীধা রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া রাজপরিষদে উপস্থিত হইলে; যেই তুমি রাজার সম্মুখে জোড়করে দণ্ডায়মান হইয়াছ, আর অমনি ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দে দশটার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণদ্বারে যাইবার বাঁকাপথ ডাইনে বামে তিন তিনটি, কিন্তু সোজাপথ সম্মুখে একটি মাত্র—যদিচ সে পথ কাটিয়া প্রস্তুত করা নাই। কর্ত্তব্যকার্য্যের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে তুমি সেই অপরিচিহ্নিত সোজা পথটি অবলম্বন করিয়া রাজাজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হইলে; আর, তোমার সঙ্গীদুজনার তর্কবিতর্কের কিছুতেই মীমাংসা না হওয়াতে, তাহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না। রাজবাটীতে যাইবার সোজা পথ যেমন এক বই দুই নহে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যকরী বুদ্ধি তেমনি এক বই দুই নহে; পক্ষান্তরে, রাজবাটীতে যাইবার বাঁকা পথ যেমন অসংখ্য, অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি (অর্থাৎ অ-কেজো লোকের বুদ্ধি) তেমনি অসংখ্য এবং তাহার ডালপালা অনেক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ফলকামী স্বর্গলোভী মূর্খ পণ্ডিতেরা বেদের দোহাই দিয়া এই যে সকল কথা বলেন যে, নানাবিধ বহুমূল্য উপকরণের আয়োজন করিয়া খুব ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরজন্মে তোমার ভোগৈশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না—এইসকল পুষ্পিত বাক্যাবলীর ছটাতে যাঁহাদের মন অপহৃত হয়, সমাধি-প্রবণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহাদের নিকটে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বড় মিয়া ছোট মিয়া প্রভৃতি ওস্তাদ গায়কেরা রাগরাগিণী ভাঁজিবার সময় মুদ্রাদোষ-সহকারে প্রভূত পরিমাণে গিট্‌কিরি জারি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহবা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, ঐ সকল ওস্তাদিঢঙের গিট্‌কিরি-বাজিতে রাগিণীর মুখ্য ভাব-মাধুর্য্য সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া মারা পড়ে, তা বই, তাহা বিধিমতে ফুটিতে পায় না। আমাদের দেশের তেমনি অনেকানেক মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বাজে ক্রিয়াকলাপে এরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, তাহার মুখ্য অঙ্গের ভাব-সৌন্দর্য্য কৃত্রিম অলঙ্কারের বোঝায় চাপা পড়িয়া তাহার প্রাণবধ হইয়া যায়—তাহা মুহূর্ত্তেকের জন্যও মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। রাগরাগিণীর মুখ্য ভাবটির প্রতি যাঁহারা মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর সেই মুখ্য ভাবটির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয়; পক্ষান্তরে, যাঁহারা গিট্‌কিরি-বাজি প্রভৃতি বাজে অলঙ্কারের প্রতি মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর ভাব-সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিজের নিজের ওস্তাদি মস্তক উত্তোলন করিয়া এবং বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। বাজে বিষয়েতে মনকে ঘুরাইয়া বেড়ানো একপ্রকার গিট্‌কিরি-বাজি; আর, আত্মার সহজ জ্ঞান এবং সহজ আনন্দে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ক্ষেত্রে মনকে বিচরণ করানো একপ্রকার রাগরাগিণীর মুখ্যভাবটির প্রতি মনকে তদ্গতভাবে সমাহিত করিয়া তাহার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য, ফুটাইয়া তোলা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচালনা কার্য্যে পরিপক্বতা লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির মূলস্থিত সহজ জ্ঞান এবং আনন্দে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কিরূপে অনাসক্তভাবে মনকে বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করাইতে হয়—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বেদশাস্ত্র ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হও, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা হইতে বিরত হও—অর্থাৎ কি খা'ব কি পরিব এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিও না—আত্মবান্ হও অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে আত্মা জাগিতেছে কার্য্যে তাহার পরিচয় দাও।" এ জায়গাটির ভাবার্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ত্রিগুণ পদার্থটা কি, সগুণই বা কাহাকে বলে এ সমস্ত বিষয়

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা চাই। আগামী বারে ঐ দুরূহ বিষয়টিতে হাত দেওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শীলশিক্ষা।

আমাদের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার স্থান না থাকাতে যে কিরূপ কুফল ঘটিতেছে আজকাল তাহার আলোচনা প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার কোন শিক্ষাতত্ত্ববিৎ লিখিতেছেন যে আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি এখন মানুষের চরিত্রের উপর দাবি যত বেশী এমন আর কোন কালে ছিল না।

আমরা যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আড়ম্বরহীন বিলাস-বিকার-শূন্য সরল জীবনের কথা বলি তখন ভুলিয়া যাই যে তাঁহাদের অনেকটা দায়ে ঠেকিয়া মিতাচারী হইতে হইয়াছিল—তাঁহাদের কালে বিলাস-পিপাসা উত্তেজন করিবার এত সামগ্রী এবং তাহা মিটাইবার এত উপকরণ ছিল কোথায়? তাঁহারা যে পরিশ্রমী ছিলেন তাহার কারণ কোনমতে কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই পরিশ্রম করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমাদের ন্যায় তাঁহাদের এত ভোগলালসা ছিল না তাহার কারণ এই সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আয়োজন তাঁহাদের সম্মুখে এত প্রচুর ছিল না। আধুনিক যুগের এই সহস্র প্রলোভন ও সামাজিক জটিলতার মধ্যে শীলবান্ হওয়া আমাদের পক্ষে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের অনেক বোঝা অনেক সমস্যা বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া স্বতঃই আমাদের যতটুকু চরিত্র গড়িয়া উঠে যথার্থ চরিত্র বলিতে কেবল সেইটুকু বোঝায় না। এই আবর্ত্তের মধ্যে যে শ্রেয়ঃপথ বাছিয়া লইতে পারে ও সেই পথে চলিবার মত যাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে সেই যথার্থ শীলবান পুরুষ।

বস্তুত আমরা বর্ব্বরতারই দ্বিতীয় স্তরে আছি। একদিকে যেমন অসভ্যেরা প্রাকৃতিক জড়বস্তুপুঞ্জের বন্ধনে আবদ্ধ, অপর দিকে তেমনি আমরা স্বরচিত বস্তুরাশির মধ্যে বন্দী হইয়া আছি। আমাদের যেগুলি বৈধ প্রয়োজন যে গুলি প্রকৃত অভাব তাহাই মিটাইবার জন্য আমাদের চিন্তা ও চেষ্টা ব্যাপৃত নহে পরন্তু লোকাচার ও ফ্যাসান যে প্রকার পানাহার বসন ভূষণ ও ঘর দরজার অনুশাসন প্রচার করে আমরা তাহাই জোগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছি। অথচ এই সঙ্কটের মধ্যে যখন শীলনিষ্ঠতা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক তখনি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে শীল-চর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হইতেছে। বলিতে গেলে চরিত্র-গঠনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। শীলশিক্ষার প্রতি এই অবহেলার কারণ আলোচনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন :—

এক কালে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার যে স্থান ছিল এখন প্রধানতঃ জ্ঞানচর্চ্চাই তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই যে ধর্ম্ম-নৈতিক শিক্ষা বর্জ্জন করা হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু বহু আয়োজনের ঠেলাঠেলির মধ্যে তাহা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক পাঠ্য পুস্তকগুলি দর্শন-বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্যে এত জ্ঞানপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে যে স্কুলের সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি তাহাতেই ব্যয় হয়। বর্ত্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ মাত্র সংখ্যা হিসাবে যদি জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় তবে এরিষ্টটল্ প্রভৃতি প্রাচীন মনষীগণের অপেক্ষা আজ আমাদের জ্ঞানের বোঝা কত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে! এরিষ্টটল্ সম্ভবত সেকালের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যারই অধিকারী ছিলেন কিন্তু এখনকার দিনে কোন লোকের পক্ষে বর্ত্তমান যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় অধিকার লাভ কত অসম্ভব! তাঁহাদের সময় ইতিহাস কত সংক্ষিপ্ত ও সবল ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বৃত্তান্ত আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানি। তা ছাড়া তখন পৃথিবীর ইতিহাসের এত কলেবর বৃদ্ধি হয় নাই; আমাদের ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই তখন ভবিষ্যৎ গর্ভে অদৃশ্য হইয়া ছিল। তখনকার সাহিত্য যথেষ্ট ক্ষীণকলেবর ছিল বটে কিন্তু তাহা ভাবের সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল—তাহার মধ্যে অল্পের ভিতর খাঁটি জিনিষটি পাওয়া যাইত।

বর্ত্তমান সমাজে বিদ্যালয়গুলি বুদ্ধিবিকাশ-চর্চ্চারই বিশেষ উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষভাবে বুদ্ধিবিকাশের চর্চ্চাই আধুনিক বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়াতে তাহাকে ধর্ম্মনীতির অনুশীলনও প্রধানতঃ চিন্তা এবং জ্ঞানের পথ দিয়াই করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের বুদ্ধিমূলক বিচিত্র বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার বিপুল প্রয়াসে এখনকার বিদ্যালয় ক্রমশই নিজের অজ্ঞাতসারে আর সমস্ত লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতেছে।

ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় চরিত্র শীলবান্ ও সার্থক হইতে পারে ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধে এখন একটি সর্ব্বব্যাপী সচেতনতা দেখা যাইতেছে।

শ্রীঅতসী দেবী।

সাধুবাক্য

রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন প্রদীপটি জ্বালিয়া, কোন সূচিকার্য্য লইয়া একাকী আমার ঘরে বসিয়া থাকি, আপন নিশ্বাসপতনের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই না, তখন আমার মন শান্তিসুখে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন যেমন আমার ঈশ্বরকে আমি একান্ত নিকটে অনুভব করিতে সক্ষম হই এমন আর কোন সময় পারি না। আমি ঠিক্ যেমনটি, আপনাকে ঠিক্ তেমনিটি বোধ করিতেই ভালবাসি—ক্ষুদ্র একটি প্রাণ, পরমেশ্বর তাহার নিকট প্রিয়তম—তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞানেই তাহার সুখ। এক একবার কাজ রাখিয়া বাতায়নের কাছে উঠিয়া যাই, চারিদিকে চাহিয়া দেখি—দেখিতে পাই নিশীথ আকাশে চন্দ্রতারকা সেই সর্ব্বশক্তিমানের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ চিরদীপ্যমান; অখিল বিশ্বের অনন্ত মহিমার কথা একবার ভাবি, আবার আসিয়া আপন কাজ তুলিয়া লই, সমস্ত হৃদয় মন প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া যায়, আমি অনুভব করি আমার মত সুখী আর কেহ নাই।

A Poor Methodist Woman.

স্বর্গীয় শক্তির নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিলে ক্রমে আমাদের চারিদিকে যে দিব্য আনন্দ-মন্দির রচিত হয়, মনের মধ্যে যে শান্তি এবং সৌন্দর্য্য প্রসারলাভ করে, পার্থিব কোনও ক্ষমতা, কোনও সুখ, কোনও অধিকার তাহা আমাদিগকে দান করিতে পারে না।

J. P. Greaves.

ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে যখন আমরা সম্পূর্ণ আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হই তখন আশাতিরিক্ত ভাবে আমাদের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, প্রফুল্লতা সহজ হয়, মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হৃদয়ে অক্ষয় তেজ সঞ্চিত হয়—সুখ হারাই না, তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, আত্মা তখন পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।

Henry More.

হে প্রভু, হে আমাদের জীবনমরণের চিরন্তন সহায়, যেখানে যেমন ভাবে তুমি আমাকে লইতে চাও, বল বিধান কর আমি যেন সেইখানে তেমনি ভাবে তোমার অনুসরণ করিতে পারি। হে অখিলশরণ, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তুমি আমাদের যে কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান করিতেছ, বিরক্তি দুঃখে যে ধৈর্য্য, কার্য্য এবং বাক্যে যে অখণ্ড নিরাময় সততা, যে নম্রতা ও দয়া আমাদের নিকট প্রত্যাশা কর, আমরা যেন ভক্তিনত-মস্তকে তাহা প্রতিপালন করিতে পারি। যদি মহত্তর আর কোন কর্ত্তব্যভার শিরোধার্য্য করিব এই তোমার অভিপ্রায় হয়, যদি তোমার নিয়মিত ধর্ম্মের জন্য, যদি তোমার মানবসন্তানদিগের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ এই তোমার বিধান হয় তবে হে ইচ্ছাময় তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

C. G. Rossetti.

তর্ক নয়, আলোচনা নয়, কার্য্যের দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্যের যথার্থ পরিচয় লাভ করি। যতক্ষণ তর্ক করিতে থাকি ততক্ষণ সমস্যার কোনই মীমাংসা হয় না কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি অমনি চারিদিক হইতে কোন্ মায়াবলে রুদ্ধ যবনিকাগুলি অপসারিত হইয়া যায়, সম্মুখে আমাদের কর্ত্তব্যের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তাহার সম্যক জ্ঞানলাভ করি। অননুভূতপূর্ব্ব-শক্তিতে হৃদয় ভরিয়া ওঠে, বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যায়, পূর্ব্বে যাহা অলঙ্ঘ্য, ভীতিউৎপাদক ছিল তখন তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। অসীম শক্তিশালী বিশ্বনিয়ামক প্রভু অচিন্ত্য উপায়ে তখন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া সেখানে অভিনব শক্তিবিধান করেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধসংযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া আমরা যেন নবজীবনে জন্মলাভ করি।

E. B. Pusey.

হে সত্য, তুমিই অনন্তকালের সম্বল, তুমি চিরন্তন, হে প্রেম, তুমিই অনন্ত সত্যের স্বরূপ, হে অনন্ত, তুমিই চির-মধুময় প্রেম, তুমিই আমার জীবনদেবতা, তুমিই আমার পরম ঈশ্বর—অহরহ নিত্য নিয়ত আমি তোমারি নিমিত্ত বিরহ-কাতর। যেদিন তোমার আমার প্রথম মিলন, যে দিন তুমি আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া উন্নত করিয়াছিলে, সেদিন আমার নেত্রে স্বর্গ-পথের যে জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দৃশ্য প্রসারিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমি তোমার সহবাসের কত অযোগ্য। আলোক-প্লাবনে আমার অন্তরের চক্ষু এবং আমার বাহিরের এই ক্ষীণ দৃষ্টিকে পরি-প্লাবিত করিয়া তুমি আমাকে দুর্ব্বলতা-দোষ-মুক্ত করিয়া-ছিলে, বারম্বার আমার কম্পিত হৃদয় প্রেমের অপার বিস্ময় এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম হে বিশ্বসম্রাট, হে নিখিল-নায়ক, তোমায় আমায় কি দূরতা, কত প্রভেদ।

St Augustine.

ভবিষ্যতের জন্য অযথা ব্যাকুল হইয়া কাহাকেও কখনোকি বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতের সমস্যা সম্যকরূপে পালন এবং পূরণ করিতে দেখিয়াছ? যদি আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ অভাবের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিরস্ত হই, যদি জীবনের দিনগুলিকে

ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিনে দিনে তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে পূর্ণ করিয়া লই, যাহা করণীয় তাহা যদি ভবিষ্যতের জন্য না ফেলিয়া রাখিয়া প্রতিদিন সম্পন্ন করি, ভবিষ্যৎ দুঃখভয়ে বর্ত্তমানকে অবহেলা না করি তবেই জীবনে আশাতিরিক্ত এবং অভিনব সুখের অধিকারী হইতে সক্ষম হইব।

F. D. Maurice.

ঘটনাসঙ্কুল এই জীবনে পরিবর্ত্তন-ভয়ে ভীত হইও না—বরং আশা এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত কর। যে পরমেশ্বর তোমার জীবন-বিধাতা, যিনি তোমার সৃজনকর্ত্তা পরমপিতা তাঁহার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন কর। দুঃখবিপত্তিতে, দুর্দ্দিন অন্ধকারে তুমিত অসহায় নও সেই কলঙ্ক-ভঞ্জন, বিপদ-বারণ দয়াময় প্রভু সতত তোমার সহায়। এতদিন তিনিই তোমায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, পুনরায় তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন, তাঁহার হাতখানি দৃঢ় করিয়া ধারণ কর, যদি হে দুর্ব্বল, আর চলিতে অক্ষম হইয়া থাক তবে আবেদন জানাও, সেই অখণ্ড প্রতাপবান, অনন্ত করুণাময় তোমায় বহন করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল কি হইবে বলিয়া ভাবনায় ব্যাকুল হইও না, সেই এক, অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয়, যিনি আজ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কাল কেন চিরদিনই তোমায় রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া ধারণ কর। হয় তিনি তোমায় দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন নয় ত তিনিই তোমাকে দুঃখ-বহনের শক্তি দান করিবেন। তবে আর কেন, শান্তি, পরমা শান্তিতে হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক—দুঃখ-কাতরতা, ভবিষ্যৎ ভীতি, অশান্ত ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ দুর হইয়া যাক।

Francis De Sales.

হে নবীন পান্থ, স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হইতেছ কিনা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ—কোন্ উপায়ে জানিতে পারিবে? আপন আবাস-গৃহখানি ভাল করিয়া একবার পর্য্যবেক্ষণ কর—আত্মার মন্দিরতোরণ ত্যাগ করিয়া কখনো দূরে যাইওনা। আপন হৃদয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া বসতি কর, বাহিরে অশান্ত ব্যাকুল চেষ্টায় ব্যর্থ অন্বেষণে উন্মাদের মত দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইও না। যদি এই অন্তর্নিবেশ অভ্যাস হইয়া যায়, তবে তখন আপন করণীয় সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবে; অন্তর্য্যামী অন্তরে যে আদেশ প্রচার করিবেন, বাহিরে তাহা পালনের উপায় দেখাইয়া দিবেন; তবে হে ভ্রান্ত, একান্ত বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে সেই দুর্লভ চরণে আত্মসমর্পণ কর—ধ্যানে কিম্বা কর্ম্মে, বিষয়-সম্ভোগে কিম্বা পরার্থপরতায়, সুখে কিম্বা দুঃখে যেখানে যেমনভাবে তিনি লইয়া যাইবেন সেই স্থানেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চল। যদি সেই ইচ্ছাময় তোমাকে নিতান্ত তাঁহার একান্ত নিকট সান্নিধ্য অনুভব করিতে না দেন তবুও ভক্তিভরে তাঁহারি উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ কর, তাঁহার নিমিত্ত, সেই চিরদুর্লভ এবং নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের নিমিত্ত বাহিরে এবং সুদূরে কর্ত্তব্যের পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে থাক।

J. Tauler.

ধৈর্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইলে পরমেশ্বরের পবিত্র নৈকট্যের অনুভূতিতে নিয়ত দৃঢ় হইতে হইবে—কে জানে কখন প্রলোভন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, কখন ধৈর্য্য, বীর্য্য এবং নম্রতার পরিচয় দান করিতে হয়। আত্মসংবরণ, ক্রোধ-বিরক্তির সংযমের দ্বারাই আমরা আত্মত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা করি। এ সংসারে কাহারও নিতান্ত স্বার্থপর হওয়া সম্ভব নহে—মানুষের যাহা কিছু একান্ত নিজস্ব, যেমন সময়, গৃহ এবং বিশ্রাম, সেখানেও সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা চলে না, সেখানেও কত আক্রমণ, কত দৌরাত্ম্য, কত ব্যতিক্রম—গৃহী ব্যক্তিকে পদে পদে আত্মসংবরণ, আত্মসংযমন এবং আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়।

F. W. Faber.

এ সংসারে শান্তি এবং সুখে বাস করিতে হইলে নিত্য নিয়ত নিয়মিতভাবে আমাদের আপন ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার নিকট পরিহার করিতে হয়—বাহিরের ভাবে কোনও আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া নীরবে নম্রতার সহিত কতবার কত পীড়াদায়ক শব্দ এবং দৃশ্য সহ্য করিতে হয়। কতবার যখন অন্য কিছু করিলে আনন্দলাভ করিতে পারিতাম, তখন তাহার বিপরীত করিতে হয়—শ্রান্ত হইলে তবুও বিরাম নাই, তবুও অধ্যবসায়ের সহিত আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, কতবার যখন একেলা থাকিতে পারিলে অধিকতর আরাম ও আমোদ উপভোগ করিতে পারিতাম তখন হয়ত কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে সামাজিকতা রক্ষা করিতে হয়; ইহা ভিন্ন জীবনে দৈনিক কত অসুখকর ঘটনা ঘটিতে থাকে, বহুকালস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, মূল্যবান পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, যত্নরক্ষিত সামগ্রী হারাইয়া যায়, বন্ধু বিমুখ হয়, নির্ম্মমতা, অকৃতজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা প্রতিকূলতা জীবনে প্রতিদিন কতবিধ দুঃখ বেদনার সৃষ্টি করে।

J. Keble.

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাবীধর্ম্ম।

(E. G. Browne সাহেবের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত)

যিনি "বাবী"-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং বাব্ নামে সকলের কাছে পরিচিত তাঁহার প্রকৃত নাম মির্জ্জাআলি মহম্মদ। তিনি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসে দক্ষিণপারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না তথাপি তিনি স্বয়ং মহম্মদের বংশধর সৈয়দ ছিলেন বলিয়া চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে পারস্যদেশ-বাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

মির্জ্জাআলি মহম্মদকে শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বিদ্যালয়ে তিনি অধিক দিন ছিলেন না। তাঁহার বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ তথাকার শিক্ষকদিগের অমানুষিক অত্যাচার। কালে যখন তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন তখন আপনার শিশু-জীবনের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে শিশুদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অবশ্যপালনীয় কতকগুলি বিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের সম্বন্ধে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন "সেই পরমাত্মা—যাঁহার কৃপাসিন্ধু হইতে বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়া জীবমাত্র জীবিত রহিয়াছে, তাঁহার দুঃখ নিবারণের জন্যই এইরূপ বিধি প্রস্তুত করা হইল; কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁহাকে জানে না, যিনি তাঁহার এবং সকলের গুরু!"

বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর মির্জ্জা মহম্মদ কিছুদিন পর্য্যন্ত পিতার বাণিজ্যে তাঁহার সহায়তা করিলেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল তখন তিনি বালকমাত্র, এইজন্য তাঁহাকে তাঁহার মাতুল হাজি সৈয়দ আলি'র বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সিরাজসহর ত্যাগ করিয়া পারস্যোপসাগরতীরে বুসিয়র সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই বাল্য বয়সেই তাঁহার বৃদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল এবং তখন হইতেই যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত সেই তাঁহার সুপবিত্র জীবন, স্বার্থহীন বৈরাগ্যের ভাব এবং সরল মধুর আচরণে মুগ্ধ হইত। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল।

কারবেলা সহর পারসিক সিয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। কারণ তৃতীয় ইমাম (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) হুসেন সেখানে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। শেখ্ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শেখ আহম্মদের এক শিষ্য হাজি সৈয়দ কাজিম সেখানে বাস করিতেন এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শেখদিগের ইমামের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই শেখ সম্প্রদায় দ্বাদশ ইমাম বা ইমাম মাহদির অভ্যুদয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে আশা করিয়া বসিয়া আছে।

একদিন একজন নূতন ব্যক্তি আসিয়া সৈয়দ কাজিমের ভক্ত শিষ্য-সংখ্যার দল বৃদ্ধি করিল। এই আগন্তুক আর কেহ নহে, সেই মির্জ্জাআলি মহম্মদ। ইনি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া বুসিয়র ত্যাগ করিয়া কারবেলা সহরে আসিয়া পঁহুছিলেন এবং সৈয়দ কাজিমের নিকট আসিয়া দ্বারের কাছে সকলের নীচের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কয়েক মাস এইরূপ নিয়মিত যাতায়াত করাতে সৈয়দ কাজিমের শিষ্যেরা সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইল এবং গুরুও এই তরুণ যুবকের একাগ্রতা এবং বিনীত আচরণে মুগ্ধ হইলেন। একদিন মির্জ্জা-আলি মহম্মদ যেমন হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন তেমনি অন্তর্হিত হইয়া জন্মস্থান সিরাজে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্প দিন পরে উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহার ব্যবস্থা করার পূর্ব্বেই সৈয়দ কাজিমের মৃত্যু হইল। আসন্ন মৃত্যুকালে রোদনরত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি বলিলেন "যাহা সত্য তাহা জগতে প্রকাশিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইবে ইহা জানিয়াও তোমরা চাহ'না যে আমার মৃত্যু হোক?" কেমন করিয়া এই সত্যের প্রকাশ হইবে তাহা তিনি আভাসে বলিলেন মাত্র, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর সকল শিষ্য মিলিয়া অনশনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর তাহারা ঈপ্সিত বস্তুর অন্বেষণে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এই শিষ্যদিগের মধ্যে মুল্লা হুসেন নামে একজন খোরাসানবাসী ছিলেন। ইঁহার সহিত গুরুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য সকলেই মনে করিত হয়ত ইনিই গুরুর উত্তরাধিকারী হইবেন। শেখরা যখন আপন আপন পথে বাহির হইয়া পড়িল তখন মুল্লা হুসেন সিরাজ সহরে গেলেন, সেখানে গিয়া গুরু ভাই আলি মহম্মদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। এই প্রিয়দর্শন যুবকের গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচয় পুনঃস্থাপনের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মির্জ্জা আলি মহম্মদ স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসাদির পর সৈয়দ কাজিম এবং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্বন্ধে উভয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল।

মির্জ্জা আলি মহম্মদ বলিয়া উঠিলেন যে তিনিই সেই গুরুর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ গুরু এবং পথ-প্রদর্শক; গুরু যে সত্য প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইবে এবং যে ইমামের সহিত সহস্র বৎসর যাবৎ শেখদিগের বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের পথে তিনিই 'বাব' বা তোরণস্বরূপ। এই কথা শুনিয়া মুল্লা হুসেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং প্রথমে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু মির্জ্জা আলি মহম্মদের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর তাঁহার মনে আর সন্দেহ রহিল না।

দেখিতে দেখিতে এই বাবের অভ্যুদয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিল। পরলোকগত সৈয়দ কাজিমের অনেক শিষ্য মুল্লা হুসেনের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অনতিবিলম্বে সিরাজ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী ভক্তদিগের উৎসাহ উদ্যমের অন্ত রহিল না। বাবের রচিত জিয়ারৎনামা (ঈশ্বর সাক্ষ্য) ইত্যাদি কতকগুলি পুস্তক তাহারা অত্যন্ত আগ্রহ এবং আনন্দের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই গুরু যখন মোল্লা বা মুসলমান ধর্ম্মযাজকদিগের বিষয়াসক্তির কথা, দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার অবিচারের কথা বলিতেন তখন শিষ্যেরা একাগ্র চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত এবং তিনি যখন দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেন যে তিনি যে সত্য প্রচার করিতে আসিয়াছেন তাহার জয় হইবেই এবং তাহার ফলে দেশে ন্যায়ের এবং সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবেই তখন যে অত্যন্ত অবিশ্বাসী সেও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিত না।

অল্প সময়ের মধ্যে বাবের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বাবীদিগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—রাজপুরুষ এবং ধর্ম্মযাজকদিগেরও দৃষ্টি পড়িল কিন্তু সে দৃষ্টি সন্দেহ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি। এমন সময়ে বাব একদিন গোপনে একজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া সিরাজ ছাড়িয়া মক্কা তীর্থে চলিয়া গেলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাব মক্কা হইতে বুসিয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিকে বাবের নিজের অন্তরের ভাব ও মত-বিশ্বাসগুলি তাঁহার নিকট সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে শাসনকর্ত্তারা এবং মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা এই নূতন ধর্ম্মমতটিকে অনিষ্টকারী বিবেচনা করিয়া উহার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বাব সিরাজে যাইবার পূর্ব্বে যে সকল শিষ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল শাসনকর্ত্তা হুসেন খাঁ তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া রীতিমত প্রহার করিলেন এবং প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন; দুইজন শিষ্যকে খোঁড়া করিয়া দিয়া তাহাদের বাড়ীর বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অশ্বারোহী সৈন্যদল গিয়া বাবকে বন্দী করিয়া সিরাজে লইয়া আসিল; কয়েকজন মুসলমান ধর্ম্মযাজক শাসনকর্ত্তার সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী সাব্যস্ত করিল এবং প্রহার করিয়া দারোগা আবদুল হামিদ খাঁ'র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

এই সকল উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই ধর্ম্ম শীঘ্রই সমগ্র পারস্য দেশে বিস্তার লাভ করিল, এবং যে সকল শিষ্য সিরাজে ছিল তাহারা নানা উপায়ে কারাবাসেও গুরুর দর্শন লাভ করিল। প্রধান দারোগাও এই বন্দীর শান্তমধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইল এবং তাঁহারই পুণ্যবলে তাহার পুত্র কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এই বিশ্বাসে সে অবশেষে বন্দী মহাত্মার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিল। ইহার ফলে এই হইল যে যখন ইস্পাহানের শাসনকর্ত্তা মুনচিহর্ খাঁ এই মহাত্মার কীর্ত্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কোন উপায়ে কারামুক্ত করিবার জন্য সিরাজে লোক প্রেরণ করিলেন তখন প্রধান দারোগা গোপনে উৎসাহ দিয়া বাবের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিল এবং তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে ইস্পাহানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

প্রায় এক বৎসর কাল বাব্ ইস্পাহানে নিশ্চিন্তচিত্তে শান্তিতে যাপন করিলেন। স্থানীয় একজন ক্ষমতাশালী ধনী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে, বিশেষত, ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার এই রক্ষাকর্ত্তার মৃত্যু হইল এবং উঁহার উত্তরাধিকারী গুর্‌গিন খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া সৈন্যগণের হেপাজতে পারস্যের সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং তাঁহার কুচক্রী মন্ত্রীর নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিল। সম্রাট বাবকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পাছে এই তেজঃপুঞ্জ যুবার অমিয়ময় বাক্যে তাঁহার মন ফিরিয়া যায় এই ভয়ে মন্ত্রী তাঁহাকে সম্রাটের সম্মুখে আনিতে দিলেন না।

বাবকে দূরস্থিত মাকু কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য পাঠানো হইল; সেখানকার শাসনকর্ত্তা

আলি খাঁ এই মন্ত্রীর বড় অনুগত ছিল। বাবকে সেখানে লইয়া যাইবার সময় সাধারণে তাঁহার প্রতি এত সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্ম দলে দলে এতলোক আসিতে আরম্ভ করিল যে তাঁহাকে সোজা পথ ছাড়িয়া অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইতে হইল। যে সকল সৈন্যের সঙ্গে তাঁহাকে পাঠানো হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

মাকু কেল্লায় বন্দী হইবার কিছু পরে বাবকে পুনরায় তাব্রিজ সহরে লইয়া গিয়া তখনকার যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং সেইস্থানে কতকগুলি প্রধান ধর্ম্মযাজক তাঁহার মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রশ্নগুলি কিরূপ ভাবে করা হইয়াছিল তাহা একমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি। এই একান্ত পক্ষপাতী বৃত্তান্ত পড়িলেও আমরা জানিতে পারি যে, যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহা হইতে প্রশ্নকর্ত্তার অনুসন্ধিৎসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল দেখা যায় বাবকে অপদস্থ করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা। তাহারা বাবকে বলিল "তুমি যখন বাব অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ তখন যে প্রশ্ন করি না কেন তাহার উত্তর দেওয়া তোমার পক্ষে কখনই অসম্ভব হইবে না" এই বলিয়া তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের ঔদ্ধত্য এবং ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে নির্য্যাতনকারীরা যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল তখন তাঁহাকে প্রহার করিয়া মাকু কেল্লায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সাধারণ লোকেরা বাবকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিত তাহা ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে কেহ তাঁহাকে প্রহার করিতে স্বীকৃত হইল না, অবশেষে ধর্ম্মযাজকেরা আপনারাই এই প্রহার-কার্য্য সমাধা করিল।

এই সকল অন্যায় অত্যাচারে ভগ্নোদ্যম হওয়া দূরে থাকুক বাব অক্ষুণ্ণ উৎসাহে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ক্রিয়া-পদ্ধতি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইয়েজ্‌দ্‌ সহরের সৈয়দ হুসেন এবং সৈয়দ হাসান এই দুই ভাই তাঁহার সহিত বন্দী হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে সৈয়দ হুসেন গুরুর লেখা নকল করিয়া দিত এবং গুছাইয়া রাখিত। মন্ত্রীর কঠিন আদেশ সত্ত্বেও এই সকল রচনা বাহির হইয়া পড়িয়া ভক্তদিগের হস্তগত হইল। বাবের ধর্ম্মমতেরও ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল। বাব বলিলেন তিনি কেবলমাত্র ইমাম মাহদি'র নিকট লইয়া যাইবার দ্বারস্বরূপ নহেন, তিনিই স্বয়ং ইমাম মাহদি, তাঁহারই অন্তরে পরম সত্যের প্রকাশ হইয়াছে এবং এতদিন তিনি যে সকল কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিছু প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা সকলের নিকট সমগ্ররূপে সরলভাবে প্রকাশ করিবেন, কিছু ঢাকা রাখিবেন না। তাঁহাতেই যে শেষ হইবে—তাঁহার দ্বারাই সত্যের চরম প্রকাশ হইবে এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পরে আরও একজন মহত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে এবং তিনিই এই নবধর্ম্মসম্প্রদায়ের আরও উন্নতি সাধন করিবেন। এই সময়ে বাবের রচনার মধ্যে দেখা যায় তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুকে কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেই তিনি বারম্বার আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিনি শিষ্যদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছেন তোমরা কখনও এই মুসলমানদিগের ন্যায় ব্যবহার করিও না; মনে রাখিও সত্য অনন্ত, সত্যকে লাভ করিয়া শেষ করা যায় না। আজ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু সত্য লাভ করা হইয়াছে ততটুকুই প্রকাশ করিতে আমরা সক্ষম, ভবিষ্যতে ইহার কত উন্নতি হইবে তাহা কে জানে?

এইরূপে এই মাকু কেল্লায় ছয় মাস কাটিয়া গেল; শাসনকর্ত্তা যখন দেখিলেন যে সেখানেও শিষ্যেরা প্রবেশলাভ করিতেছে তখন তাঁহার আদেশে বাবকে দুরধিগম্য চিহরিক কেল্লায় লইয়া যাওয়া হইল। এইখান হইতেও, বাদামের খোসার ভিতর পুরিয়া, দুধের ভিতর ডুবাইয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে তাঁহার চিঠি শিষ্যদের হস্তগত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার যে প্রদেশে আমরা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলাম গ্রীষ্মকালে সেখানে শস্যক্ষেত্রে একবার একটা গুরুতর ছাতাপড়ার ব্যাধি (fungous disease) অত্যন্ত প্রবল হইয়া কৃষকদের কোনো কোনো ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিল। এই ব্যাধির প্রতিকারের জন্য সমস্ত প্রদেশটার প্রধান কৃষকেরা কৃষি-ব্যবস্থা-সমিতির সাহায্যে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া, ব্যাধির লক্ষণাদি তদন্ত করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। আমি আমার এক জাপানী সহপাঠীর সঙ্গে গ্রামের একটী সভায়

গিয়াছিলাম। সেখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত কৃষকদের বক্তৃতা প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া শুনিলাম। অবশ্য কোনো কোনো বক্তা যদি তাঁহাদের ভাষার ছন্দে, সুরে, নৈপুণ্যে মনের সাধে হাসিয়া লইবার সুযোগ আমাদের না দিতেন তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য রাখিয়া বক্তৃতা শোনা সম্ভবপর হইত না।

একটা প্রকাণ্ড ক্যাম্বিসের উপর নিম্নলিখিত বাক্যটী বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া, একজন লোক সভাগৃহের প্রবেশ-দ্বারের কাছে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া ছিল। "If we donot hang together now, we shall have to hang ourselves separately." বাংলায় এই বাক্যটাকে এই ভাব তর্জ্জমা করা যাইতে পারে :—যে বাঁধনে সকলে একত্রে মেলে এখন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে যে বাঁধনে গলায় দড়ি দিয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ঝুলিয়া মরে তাহাই আমাদের ভাগ্যে জুটিবে। আমার সঙ্গী জাপানী বন্ধুটী কথাটী পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন "রুসিয়া যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিল তখন আমরা এই বাক্যের মধ্যে যে একটী সার্থক শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই আমরা দেশের মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলাম।" তার পর, জাপানী বন্ধুটি তাঁহার দেশের নানাপ্রকার উৎসাহ উদ্যম উদ্যোগের খবর আমাকে বলিতে লাগিলেন। সেদিন হইতেই জাপানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, এবং সেই অবধি জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাস আমার কাছে অত্যন্ত সুখ-পাঠ্য।

পৃথিবীতে আজ যে কঠোর সংগ্রামের ঝড় বহিয়া যাইতেছে, কোনো জাতিকে তাহার মধ্যে আপনার বিশেষত্ব, মান, গৌরবকে অটুট রাখিতে হইলে মিলিবার শক্তিকে সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিতেই হইবে। শক্তির এই উৎসকে খুঁজিয়া বাহির না করিয়া আর যাহাই করিবার উদ্যোগ হউক না কেন, সমস্তই নিষ্ফল হইবে। কয়েক শতাব্দী হইতে এসিয়ার মধ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, যাহা তাহার মর্ম্মস্থানকে আক্রমণ করিয়াছে, যে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আকর্ষণে এসিয়াবাসীগণ তাহাদের সমস্তই বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে, সে কঠিন সমস্যার মীমাংসার পথ এসিয়া কখনই আবিষ্কার করিতে পারিবে না যত-দিন না এসিয়া সমবায় চেষ্টা দ্বারা নিজেদের উচ্চতর স্বার্থকে বজায় রাখিতে না শিখিবে। জাপানীরা উহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই জাপানের চিত্ত দেশের সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্রেই সচেষ্টভাবে জাগ্রত হইয়াছে।

জাপানের শক্তি দুইটি ধারায় আপনাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। একটী, উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টাকে ব্যবস্থাবদ্ধ করিবার শক্তি; আর একটি, নিজের বিশেষ জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে শিক্ষা-গ্রহণ। জাপানীরা দেশের কৃষিউন্নতির জন্য যাহা করি-তেছেন তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের কৃষকেরা গড়ে যত জমি চাষ করিতে পায়, ভাগ্য-দেবতা জাপানী কৃষকের অংশে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু মঞ্জুর করেন না। অথচ এই একই পরিমাণ জমি লইয়া তাহারা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও যাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছে আমা-দের দেশের কৃষকেরা তাহা পারিতেছে না। আমাদের তুলনায় ইহাদের চাষের উপযোগী জমিরও পরিমাণ কম। ১৯০৪ সালের গণনানুসারে সমস্ত দেশের জমির মধ্যে (ফরমোসা বাদ দিয়া) শতকরা ১৫ ভাগ জমি চাষোপযোগী। শতকরা ৫৫ জন প্রত্যেকে ৬ বিঘার কিছু কম, ৩০ জন প্রায় ১০ বিঘা, বাকী ১৫ জন তদধিক পরিমাণ জমি চাষ করিতে পায়। এই জমিও সবক্ষেত্রে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। অল্প পরিমাণ জমিও বহু খণ্ডে বিভক্ত; সেই জন্যেই কৃষি-উন্নতিকল্পে যত যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, জাপানীরা তাহা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া আমেরিকার কৃষকদের ন্যায় শ্রমের লাঘব করিবার সুযোগ পায় না। যন্ত্রাদি পুরাতন ধরনের হইলেও ইহারা অল্প জমিতে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করে এবং ইহারই ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ ইহারা ধান যব, গম, আলু, চা, তামাক, তুলা, নীবার ইত্যাদি শস্যের চাষ করে। সম্প্রতি জাপানীরা পশু-জননের প্রতিও দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে কৃষকেরা তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যেমন কেবলমাত্র উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করে, এবং তাহা না পাইলে অনাহারে মরিতে থাকে, কর্ম্মিষ্ঠ জাপানীকে তেমন শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হয় না। কেননা তাহারা কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা অর্থ-করী ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। আমার জাপানী বন্ধুটির কাছে শুনিয়াছি যে তাহাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক রেশম পোকা পুষিয়া যথেষ্ট রেশম সূতা উৎপন্ন করে। আমে-রিকাতেও দেখিয়াছি যেসকল কৃষকের জমিজমা অল্প তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র ফসলের উপর নির্ভর না করিয়া ঘরে বসিয়া নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করে। এই শ্রেণীর কৃষকদের ঘর হইতেই সহস্র সহস্র ভাণ্ড মধু উৎপন্ন হয়। আমাদের এই বাংলা দেশের কৃষকদের মধ্যে কোনো প্রকার ছোট খাট ব্যবসার পথ খুলিয়া দিতে পারিলে অল্পদিনের মধ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে নূতন জীবনের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এদিকে আমা-

দের দৃষ্টি নাই। যাহাদের হাতে বাংলাদেশের বহু সংখ্যক প্রজার সুখদুঃখের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই জমিদারবর্গ যদি কেবলই নিজেদের ভোগবিলাসের দিকে না তাকাইয়া বাংলার গ্রামে গ্রামে ক্রমশঃ ছোট ছোট ব্যবসা খুলিবার জন্য প্রজাদিগকে উৎসাহিত করেন তবেই তাঁহাদের জমিদারী শোভা পায়, এবং প্রজাদের কাছে তাঁহাদের ঋণ কতকটা শোধ হইতে পারে।

আমি যে বিশেষভাবে জমিদারদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি তাহার একটি কারণ আছে। আমাদের দেশে কৃষকদের উন্নতি-সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কিছু মনোযোগ করিয়াছেন কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যে উপায়ে ও যাঁহাদের দ্বারা এদেশে গবর্ণমেণ্টকে কাজ করিতে হয় তাহাতে জনসাধারণের সহিত যথার্থভাবে তাঁহাদের যোগ ঘটিতেই পারে না। এই কারণে এদেশে সরকারী কৃষিবিভাগের সমস্ত কাজকর্ম্ম ও অভিজ্ঞতা আমাদের জনসাধারণের আয়ত্তের অতীত। এমন কি, তাহার কার্য্যবিবরণী দেশীয় ভাষাতে প্রকাশ ও বিতরণ করিবার কোনো চেষ্টামাত্রও নাই। এই সকল বিভাগের যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহারা কৃষকদিগকে কৃষি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান দিবার বা আনুকূল্য করিবার জন্য তাহাদের সহিত বিশেষভাবে যোগ রাখিয়াছেন বা যোগ রাখিতে পারেন এমন কোনো লক্ষণই ত আমরা দেখিতে পাই না। জাপানে দেশের শ্রমজীবিদের ও কৃষকদের সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে উন্নতি হয়, যাহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রচুর আয়োজন করিতেছেন, নানাভাবে দেশের সম্মুখে কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছেন। আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জর্ম্মণিতে, জাপানে গবর্ণমেণ্ট যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের দেশে জমিদারগণকে সেই সমস্ত দায়িত্ব যতদূর সম্ভব বহন করিতে হইবে। কৃষি-উন্নতিকল্পে জাপান গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে সকল কাজ অনুরোধের দ্বারা কিংবা আর কোনো উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে আইনের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যথা, জলসেচনের ব্যবস্থা করা, অরণ্যগুলির যত্ন লওয়া, নদীতে বাঁধ দিয়া, খাল কাটিয়া নানা উপায়ে কৃষি-উন্নতির ব্যবস্থা করা, কৃষকদের জন্য সম্প্রদায় গঠন করা (Farmers guid) ইত্যাদি কর্ম্ম আইনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশের জমিদারেরাও বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে প্রজাদিগকে এই প্রকার উন্নতির পন্থা আশ্রয় করিতে অনেকটা পরিমাণে বাধ্য করিতে পারেন।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যাহাই করা হউক না কেন, যদি সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার না করা হয় তবে কোন কর্ম্মেরই শিকড় দেশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না এবং ফলও স্থায়ী হয় না। এইজন্য জাপান-গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের সাধারণভাবে কৃষি ও তদানুষঙ্গিক-বিষয়-সকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছয়টী কৃষি-স্কুলের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কৃষিসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে কৃষিজীবিদিগকে আহ্বান করা হয়। মাঝে মাঝে কতকগুলি গ্রামের কৃষকেরা এই ভাবে একস্থানে মিলিত হওয়াতে একদিকে যেমন পরস্পরের মধ্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ অলক্ষ্যে ফুটিয়া ওঠে, অপরদিকে ইহাদের চিত্তেরও পরিণতি হইতে থাকে। এই সকল পরীক্ষাক্ষেত্র ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট হইতে গরু ভেড়া মুরগীর উন্নতিকল্পে পরীক্ষাগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে এই সকল পরীক্ষাগারের, পরীক্ষাক্ষেত্রের কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে। যাহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সুদক্ষ চালকের হাতে অর্পিত হইতে পারে এইজন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া যোগ্য করিয়া আনেন।

কৃষি-উন্নতির চেষ্টা করিতে গিয়া জাপান দেখিলেন যে, এমন অনেক কৃষিজীবী আছে যাহারা অর্থাভাবে তাহাদের স্বল্প জমিটুকুর চাষ করিতে পারে না, পরীক্ষাগার বা পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে যে সকল অভিনব পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহার খরচ জোগাইতে পারে না অতএব যাহাতে ইহার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে জাপান-গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে তাহাই ভাবিলেন।

অর্থদৈন্য হইতে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষিজীবিদের সাহায্য ও সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। জমি জমা বন্ধক রাখিয়া কৃষককে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কগুলি রাজস্ব-সচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। টাকা কর্জ্জ লইবার পূর্ব্বে কি ভাবে টাকা ব্যয় হইবে সে কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হয় কেবল মাত্র কৃষি-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মের জন্যই কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের নিয়ম। এই জন্যই পতিত জমির উদ্ধার-কার্য্য, জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি, জলসেচনের ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরী, শস্যের বীজ সংগ্রহ, উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ক্রয়, গ্রামের বাড়ীঘরের উন্নতি-সাধন প্রভাবে জাপানী কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিরা ক্রমশঃই সতেজ হইয়া উঠিতেছে। এ কেবল এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। কৃষিজীবিদের সম্প্রদায়গুলি (Farmers' guilds) ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা-প্রকার উন্নতির চেষ্টা করেন। এইরূপে জাপান অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশের কাছ হইতে

শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশের আবশ্যকতা অনুসারে নানা প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জাপানের কৃষি-উন্নতি এই বাক্যটিকেই প্রচার করিতেছে যে, সমগ্র কল্যাণের গোড়ার কথা সমবেত চেষ্টা। বাংলা দেশের সমস্যার মীমাংসাও এইখানে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরীরের শত্রু ও মিত্র।*

পুরাকালের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় 'পন্টসের' রাজা মিথ্রিডেটিস্ পাঠানুরক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উৎসাহশীল ছিলেন। তিনি সকল প্রকার বিষ নিজের শরীরে অতি অল্প মাত্রায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া অবশেষে এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে কোন বিষেই আর তাঁহার কোন অপকার করিতে পারিত না। রোমানেরা যখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল তখন তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার শরীরে কোনো বিষেরই ক্রিয়া হয় না। এই জন্যে বিষের অপকারিতা নিবারণের জন্য অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া শরীরে বিষ সহাইয়া লওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিথ্রিডেটিজম্ বলে।

প্রয়োজনবশত মানুষকে নানা প্রতিকূল অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, যথা অতিরিক্ত শীত, গরম বা বর্ষা সহ্য করা, অতিরিক্ত লবণাক্ত বা একেবারে লবণবর্জ্জিত খাদ্য খাওয়া, কিছুকাল অনশনে যাপন করা ইত্যাদি। এইরূপে যেমন তাহা ক্রমে মানুষের অভ্যস্ত হইয়া যায়, তেমনি তামাক, সুরাসার, এমন কি, আর্সেনিক্ প্রভৃতি ধাতব বিষও অল্পে অল্পে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইলে তাহাতে মানুষের আর কোনও অপকার করিতে পারে না এই বিশ্বাস পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব হয় তখন তাহার কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আমাদের শারীর প্রকৃতি বিষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করে না। মানুষ এবং অন্য উন্নত জন্তুর রক্তের মধ্যে এবং রক্তের চারিদিকে ছোট ছোট জীবকোষ আছে; ইহাদের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। ইহারাই প্রত্যেকে বিষাক্ত জীবাণু এবং সকল প্রকার বিষের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করে। উন্নত জীবের রক্ত যে কি একটা অদ্ভুত পদার্থ তাহা আমরা খুব কম লোকেই জানি।

আমাদের শিরায় বহমান রক্তপ্রবাহ কেবল যে পরিপাক করা খাদ্যকে নাড়ির আবরণের ভিতর দিয়া শোষণ করিয়া লয় তাহা নহে, যেখানে যেখানে তাহাদের প্রয়োজন সেখানে তাহাদিগকে বহন করিয়া ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দেয়। শরীরের প্রত্যেক অংশে যে সকল পদার্থ ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে এই রক্তস্রোত তাহাদিগকে সরাইয়া দেয় এবং ফুস্ফুসের বায়ুর থলিগুলির গা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইবার সময় কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাসকে দূর করিয়া দিতে থাকে। শরীরের অন্যান্য বর্জ্জনীয় পদার্থ মূত্রাশয় হইতে বাহির হইয়া যায়। রক্তের এই প্রবল প্রবাহ শরীরের প্রত্যেক অংশকে পরস্পরের সহিত যোগযুক্ত করিয়া রাখে। পঁচিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই এই দ্রুতগামী রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসে। এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে এই রক্তপ্রবাহের মধ্যে যদি কোনরূপ বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে তবে সে কি ভয়ানক ব্যাপার হয়।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রণালীর নানা পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে এই রক্ত এবং তাহার আশ্রিত সজীব কোষগুলি জীবরক্ষার উপযোগী অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। জীবরক্তের সকল কণাই লাল রঙের নহে। তাহার মধ্যে যে শ্বেত কণিকা আছে তাহারাই আমাদের দেহরক্ষকের দল। এক চামচ রক্তে ইহার সংখ্যা আটশত কোটি। এই যে সকল জীবকোষ শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার কাজে নিযুক্ত আছে ইহাদিগকে রুষীয় বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ্ প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সামান্য প্রাণীদের দেহেও ইহারা বাস করে। অতি ক্ষুদ্র জলের কীটের দেহেও অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই জীবকোষগুলি বাহির হইতে প্রবিষ্ট অন্য জীবাণুকে ভক্ষণ করিতেছে।

উন্নততর জন্তুদের শরীরতন্ত্রে একপ্রকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে তাহার ফলে ক্ষত ও অনেক প্রকার ব্যাধিতে তাহাদের ব্যাধিগ্রস্ত অংশে প্রদাহ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তখন রক্তনালীর পৈশিক আবরণের উপর স্নায়ুর বিশেষ প্রভাববশতঃ সেখানে রক্তপ্রবাহ বাধা পাইয়া জমিয়া উঠিতে থাকে। তখন ঐ খাদক জীবাণুগুলি সেই রোগদূষিত স্থানে প্রবেশ করে এবং ব্যাধিজীবাণু এবং অন্যান্য অনিষ্টকর পদার্থগুলিকে খাইয়া নষ্ট করিতে থাকে।

যে সকল জীবকোষ এবং শারীর কোষের উপর দিয়া রক্ত বহিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ রাসায়নিক গুণ জন্মিয়াছে। এই রাসায়নিক শক্তি

---

* অধ্যাপক রে-ল্যাঙ্কেষ্টারের রচনা হইতে।

নানা প্রকারের। প্রথমত এই খাদক জীবাণুগুলি ব্যাধিজীবাণুর বিষকেই সেই বিষের প্রতিকারকরূপে পরিণত করিয়া দিতে পারে। এইরূপে বিষপদার্থই (toxin) বিষহারী পদার্থ (anti-toxin) হইয়া দাঁড়ায়। রক্তের শ্বেতজীবাণুগুলি এই বিষ পদার্থের পরমাণু-সমষ্টিকে এমন কি এক প্রকারে নাড়া দিয়া দেয় যাহাতে তাহাদের অণুসমাবেশের রূপান্তর ঘটে—এবং এই রূপান্তরিত পদার্থ তাহাদের আদিকারণ বিষ পদার্থের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইয়া তাহার অপকারিতা নষ্ট করিয়া দিতে থাকে।

এই জীবাণুঘটিত রক্তের মধ্যে আর এক প্রকারের বিষ-প্রতিরোধক রাসায়নিক গুণ জন্মায়; ঐ রক্ত নিজেই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া ব্যাধি-জীবাণুর ক্ষতি করিতে থাকে। উহা অ্যালেক্সিন্ নামক ব্যাধি-জীবাণুনাশক বিষ উৎপন্ন করে। এই বিষ সহজ অবস্থাতেও মানুষের শরীরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু টাইফয়িড্ প্রভৃতি রোগের ব্যাধি-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। পুনশ্চ রক্তের মধ্যে আর এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহা ব্যাধিজীবাণুগুলিকে একেবারে হত্যা করিতে পারে না কিন্তু তাহাদিগকে অসাড় করিয়া দেয়। তখন তাহারা পরস্পর জমাট হইয়া নিশ্চেষ্ট পিণ্ড আকারে চাপ বাঁধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি-জীবাণুকে জমাট করিয়া তুলিবার বিষ ভিন্ন প্রকারের এই জন্য কাহারও টাইফয়িড্ হইয়াছে কি না সন্দেহ জন্মিলে তাহার শরীর হইতে এক ফোঁটা রক্ত লইয়া তাহাতে টাইফয়িড্ জীবাণু ছাড়িয়া দিলে যদি দেখা যায় তাহারা জমাট বাঁধিতেছে তবে বোঝা যাইবে যে রোগীর রক্তে উক্ত প্রকারের বিষ জন্মিয়াছে, অতএব তাহার টাইফয়িড হইয়াছে।

দেহরক্ষক জীবাণুগুলি যদিচ ব্যাধিজীবাণুকে ভক্ষণ করে তথাপি সকল সময়ে তাহারা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে খায় না। যদি ব্যাধিজীবাণুকে কোনো উপায়ে খাদক জীবাণুদের বিশেষভাবে মুখরোচক করিয়া তোলা যায় তবে তাহারা উৎসাহের সহিত ভক্ষণ কার্য্যে লাগিতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে ব্যাধিবীজ শরীরে প্রবেশ করিলে রক্তের এমন একটি রাসায়নিক গুণ জন্মে যাহাতে সে এক প্রকার স্বাদুরসের দ্বারা ব্যাধিবীজকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। এই রসকে অপসোনিন্ বলে। এই রসের আকর্ষণে খাদক জীবাণুরা পরম আগ্রহে শত্রুভক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহাতে আমাদের রক্তের শ্বেতকণিকাগুলির লুব্ধতা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের আহারে অরুচি না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের শরীররক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভেক প্রভৃতি জন্তুর শরীরের রস্ (serum) লইয়া তাহার মধ্যে ওলাউঠার বীজাণুকে যদি পালন করিয়া তোলা যায় তবে তাহা সাংঘাতিক বিষ উৎপাদন করে। অথচ এই জীবাণুকেই যদি সেই জন্তুর সজীবদেহের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে লেশমাত্র পীড়া হয় না কেন? কারণ এই ব্যাধিজীবাণুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিষ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই শরীরের রক্তের সতর্ক প্রহরীগুলি আসিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে।

খাদক জীবাণুগুলিকে লুব্ধ করিবার জন্য ঐ স্বাদুরস উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা রক্তের মধ্যেই আছে বটে কিন্তু ব্যাধিশত্রু রক্তের মধ্যে প্রবেশ না করিলে রক্ত ঐ রস উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্যাধি-জীবাণুকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়া যদি তাহাকে মানুষের শরীরের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই মৃত জীবাণুর সংস্রবেও রক্তের মধ্যে সেই স্বাদুরস উৎপন্ন হয়। রক্তের মধ্যে মৃত জীবাণু প্রবেশ করাইলে সুবিধা এই যে স্বাদুরস অপ্সোনিন্ ত উৎপন্ন হয়ই অথচ জীবাণু মৃত বলিয়া শরীরেও কোনো অপকার করিতে পারে না। ইহার পর যদি ঐ রোগের জীবিত জীবাণু দেহে প্রবেশ লাভ করে তবে খাদক জীবাণু আসিয়া বিনা বিলম্বে পরম উৎসাহে আহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ এবং উন্নত জীবের শরীরের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এইরূপ এক অদ্ভুত সংগ্রাম অনবরত চলিতেছে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাদু।

সাসৈঁ সাঁস সঁভারতা
এক দিন মিলহই আই
সুমিরণ পৈঁডা সহজকা
সতগুরু দিয়া দেখাই

খাসে খাসে সামলাইতে সামলাইতে একদিন মিলিবেনই আসিয়া। সহজের স্মরণের পথ সদ্গুরু দিয়াছেন দেখাইয়া।

এক মহূরত মন রহই
নাউ নিরঞ্জন পাস।
দাদূ তবহী দেখতা
সকল করমকী নাস॥

এক মুহূর্ত্ত মন যদি থাকে নাম * নিরঞ্জনের পাশ,
তবেই দাদূ দেখে সকল কর্ম্মের নাশ।

দাদূ রাম অগাধ হৈ
পরিমিতি নাহীঁ পার।
অবরন বরন ন জানিয়ে
দাদূ নাউ অধার॥

দাদূ রাম অগাধ হৈ
বেহদ লখা ন জাই।
আদি অংত ন জানিয়ে
নাউ নিরন্তর গাই॥

দাদূ রাম অগাধ হৈ
অকল অগোচর এক॥
এক্টে অল্লহ রাম হৈ
সমরথ সাঈঁ সোই॥

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, না আছে (তাঁর) পরিমিতি নাহি আছে পার। অবর্ণ বর্ণ (প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা) তাঁহাকে জানিও না, হে দাদূ, নামই আধার।

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, অসীম তিনি লক্ষ নাহি হয় আদি অন্ত যায় না পাওয়া যদি গাও নিরন্তর নাম।

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, অগম্য তিনি, অগোচর তিনি, তিনি এক। আল্লা ও রাম তিনি একই, তিনিই সমর্থস্বামী।

সরগুন নিরগুন দৈ রহে
জৈসা তৈসা লীন্হ

সগুণ নির্গুণ দুইই বিদ্যমান, যেমন ঠিক তেমনই করিলাম গ্রহণ।

দাদূ সিরজন হারজে
কেতে নাম অনন্ত

হে দাদূ, সৃজন যিনি করিতেছেন কত তাঁহার নাম! (তিনি যে) অনন্ত।

ঐসা কৌন অভাগিয়া
কছু দিঢ়াবই ঔর।
নাউ বিনা পগ ধরন কো
কহহু কহাঁ হৈ ঠৌর॥

এমন আছে কোন অভাগ্য যে দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়াছে অন্য কিছু। নাম বিনা চরণ রাখিবার স্থল কোথায় আছে ঠাঁই। †

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

কোথায় বজ্রপাতের সম্ভাবনা।

কোন্ কোন্ স্থানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা অধিক ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রুসিয়ার এক প্রদেশে ১৮৭৪ সাল হইতে বজ্রপাতের হিসাব রাখা হইয়াছিল; এই সংগৃহীত তথ্য হইতে ইহা দেখা যায় যে জলাভূমিতেই বজ্রপাতের অধিকতর সম্ভাবনা। অরণ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতের সংখ্যা কমিয়া যাইতে এবং অরণ্য-ধ্বংশের সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। সহরের সঙ্গে তুলনায় গ্রামে বজ্রপাতের প্রকোপ প্রায় দ্বিগুণ। যে সকল গৃহ ইহার আঘাতে জীর্ণ হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া দেখা যায় যে কাঠে কিংবা খড়ে আচ্ছাদিত গৃহগুলির সংখ্যাই বেশী।

অনেকের এই ধারণা যে গাছপালা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করে কিন্তু দেখা গিয়াছে তাহা সত্য নহে; পনর বৎসরকাল মধ্যে হত প্রাণীর সংখ্যা ত্রিশ জন ব্যক্তি ও তিন শত তিরানব্বইটি জন্তু। ঘরের ভিতরে মোট ২৯০ জন বজ্রাহত ব্যক্তির মধ্যে কেবলমাত্র ১৯ জন, এবং ঘরের বাহিরে ২২ জনের মধ্যে ১১ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। বাহিরে আহতের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ যে ঝড়ের সূচনা হইলেই স্বভাবতঃ লোকেরা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সাংঘাতিক রূপে আহতের সংখ্যা শতকরা হিসাবে গণনা করিলে দেখা যায় যে বাহিরে আঘাত-প্রাপ্তের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। উহার কারণ এই যে যখন বজ্র কোনো একটা গৃহের উপর পড়ে তখন তড়িতের অনেকটা শক্তি ইহার উপর ব্যয় হয় অথবা গৃহেস্থিত নানাপ্রকার তড়িৎ-সঞ্চারক দ্বারা —(যথা ড্রেন্, পাইপ্ ইত্যাদি) দিয়া তড়িতের শক্তি ভূমিতে বিলীন হইয়া যায়। আবার খোলা মাঠে গাছের নীচে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি, কেননা বর্ষাসিক্ত

---

* "নাম"—সজীব সচেতন পুরুষাত্মক সত্তাকে হিন্দুস্থানী সাধকরা "নাম" বলেন। আমাদের ডাকটি সেখানে পৌঁছিলে সমস্ত বিশ্ব সাড়া দেয়। অন্যথা সমস্ত বিশ্ব বধির।

† আমরা যেখানেই পা রাখি সেখানেই ব্রহ্ম। সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম সাড়া দিতেছেন। সকল ভুবনে যে ব্রহ্ম আছেন তিনিও অসাড় ব্রহ্ম নহেন—তিনি "নাম ব্রহ্ম"। অর্থাৎ সচেতন পুরুষ ব্রহ্ম। সেই নামকে অতিক্রম করিয়া পা রাখিবার কোথাও ঠাঁই নাই। এমন ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যে আশ্রয় লইতে চাহে অন্যত্র, সে হতভাগ্য।

পাতাগুলি হইতে ভূমিতে তড়িৎ সঞ্চারিত হইবার পক্ষে, গাছের শুষ্ক কাণ্ড অপেক্ষা মানুষের দেহযষ্টি সহজ পথ।

রক্ত সঞ্চারণ।

নিরাময় দেহ হইতে আসন্নমৃত্যু রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চারিত করিয়া জীবন বাঁচাইবার প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোকের ধারণা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহা বহুদিন হইতে প্রচলিত, কিন্তু সবেমাত্র সেদিন এই চেষ্টা সফল হইয়াছে। রক্তে ফাইব্রিন নামক ডিম্বের শ্বেতাংশজাতীয় এক প্রকার পদার্থ আছে; ইহাই বাতাসের কিংবা যে সকল শারীর তন্তুর ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা ব্যতীত আর কিছুর স্পর্শে জমাট বাঁধিয়া যায়। ফাইব্রিন্-হীন রক্ত ব্যবহার করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; উষ্ণ লবণাক্ত জল ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থের ব্যবহারও সন্তোষজনক হয় নাই। সম্প্রতি হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে এক ব্যক্তির শিরা হইতে অপর একজনের শিরায় সদ্য উষ্ণ রক্ত সঞ্চারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বেল্‌জিয়মের এক বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত একজন লেখকের মন্তব্য এই স্থলে অনুবাদ করিতেছি।

"যখন আমি বালক, কোনো এক বিদেশীয় চিত্রশালার দেউড়িতে একটি ছবি অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম; একজন ডাক্তার বলিষ্ঠকায় এক যুবকের দেহ হইতে এক আসন্নমৃত্যু স্ত্রীলোকের দেহে রক্ত সঞ্চারণ করিতেছেন, এবং ইহাতে স্ত্রীলোকটী ক্রমশঃই যেন নূতন জীবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে পড়িল প্রাচীন রাসায়নিকেরা এক ধাতুকে আর এক ধাতুতে পরিণত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন সেও কতকটা এই জাতীয়। আজ বহু যুগের সেই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে; আজ আমরা রেডিয়োতেজোময় (Radio-active) পদার্থের আলোচনা করিয়া একদিকে যেমন ধাতুর অপূর্ব্ব রূপান্তরের বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেছি, সেই প্রকার নানাবিধ অদ্ভুত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে দেহান্তর হইতে রক্ত সঞ্চারণ করিয়া মরণাপন্ন রোগীকে সতেজ করিয়া তোলা সম্ভব। কিছুকাল অবধি চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ যে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তাহারি সূত্র ধরিয়া আজ তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। অল্প কিছুদিন হইল নিউইয়র্কের এক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক একটা প্রাণীর মূত্রাশয় বাহির করিয়া ফেলিয়া আর একটি মূত্রাশয় বসাইয়া দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন; আর একজন ডাক্তার একটি কুকুরের মাথা আর একটি কুকুরের উপর বসাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

একবার ফাইব্রিন্ বাহির করিয়া দিয়া ভেড়ার রক্ত এক রোগীর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এক জাতীয় প্রাণীর রক্ত অপরের পক্ষে বিষবৎ; কাজেই এই পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। তারপর একই জাতীয় প্রাণীর ফাইব্রিন্-বর্জ্জিত রক্ত লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে। কেননা রক্ত হইতে ফাইব্রিন্ বাহির করিয়া লইলেই কোষাত্মক পদার্থগুলি নষ্ট হয়। অবশেষে এই কয়েক বৎসর হইল একজনের শিরার জোড়মুখে অপর একজনের ধমনী কোনো প্রকারে সংযুক্ত করিয়া রক্ত সঞ্চারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংযোজনের জন্য কোনো জন্তুর শিরা কিংবা কেবল মাত্র একটি কাঁচের নল ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। ইতিমধ্যে জর্ম্মানির একটি নগরে প্রায় দশটি রোগীর এই ভাবে চিকিৎসা হইয়াছে। উত্তরোত্তর এই প্রণালী চিকিৎসাশাস্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়া বিংশতি শতাব্দীর জয়স্তম্ভের উপর নূতন একটি চূড়া রচনা করিবে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ আশা করিতেছেন।

নক্ষত্রের সংঘাত।

কি ভাবে দুইটি জ্যোতিষ্কের পরস্পর সংঘাতে একটি কৈন্দ্রিক সূর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে আমেরিকার এক জ্যোতির্ব্বিৎ অধ্যাপক তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়, সে আপনার শক্তিগুলিকে বিকিরণ করিয়া দিয়া একেবারে নিঃশেষ করিতে চাহিতেছে; এই প্রকার সংঘাতের বিপ্লব ঘটাইয়া প্রকৃতি এই ব্যয়ের চেষ্টাকে নিরস্ত করিতেছেন। নভোমণ্ডলের যে সকল স্থানে কদাপি তারা দৃষ্ট হয় নাই অকস্মাৎ সেইখানে একটি তারাকে জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়; জ্যোতির্ব্বিদেরা মনে করেন ইহা জ্যোতিষ্কের সংঘাতজনিত। এই প্রকার অত্যুজ্জ্বল তারা অনেকবার দেখা গিয়াছে। কোনো কোনোটা এত উজ্জ্বল যে দিনের আলোতেও তাহা দৃষ্ট হয়। ১৯০১ সালে যেটী দেখা গিয়াছিল তিন দিনের মধ্যে তাহা ২৫০০০ গুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কয়েক ঘণ্টাকাল সিরিয়াস্ নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই সংঘর্ষণে এমন উত্তাপের সৃষ্ট হইয়াছিল যে বাষ্পরাশি এক মুহূর্ত্তে ২০০০ মাইল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই নবজাত নক্ষত্রের দূরত্ব এত যে আলোকরশ্মি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ছুটিয়াও তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের কাছে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে এই সংঘাত যথার্থ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদের সংজ্ঞানাশ।

সম্প্রতি নিশ্চেতনক পদার্থ ব্যবহার করিয়া অল্পকালের মধ্যে গাছে ফুল ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কথাটা শুনিয়াই হয় ত কাহারো মনে হইতে পারে যে চেতনাহারী পদার্থ ব্যবহারে গাছের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং মুকুলিত হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক ঘটিতেই পারে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। গাছকে মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে শক্তির সঞ্চয় করিবার জন্য কিছু কাল বিশ্রাম সম্ভোগ করিতে হয়। কোনো নিশ্চেতনক পদার্থ প্রয়োগে এই বিশ্রাম কালটী সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় তরুপালন-শালায় কৃত্রিম কোনো উপায়ে উত্তাপ জন্মাইয়া অসময়ে ফুল ফোটান হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিদের প্রাণশক্তিকে কেবলি তাড়না করিলে চলে না। যখন সে আপন সাধ্যের

চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে তখন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া চাই। এই জন্যেই উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা বৃক্ষাদির স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে রোধ করিবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ডেনমার্কের একদল পণ্ডিত দীর্ঘকাল উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সমগ্র জীবনে তিন অবস্থায় মাত্র উদ্ভিদের নিদ্রা ঘটিয়া থাকে। (১) পাতা ঝরিবার পর (২) শ্রান্ত হওয়ার পর (৩) এবং বসন্তে গাছের নিদ্রা ভাঙ্গিবার সময় যদি আবহাওয়ার কোনো বিশেষ কারণে তাহার বৃদ্ধি হইবার বাধা ঘটে তবে সেই অবস্থায়।

গাছকে প্রথম দুই নিদ্রিত অবস্থার ভিতর দিয়া কোনো উপায়ে সচেষ্ট অবস্থায় আনিয়া পৌঁছান সম্ভব এই মনে করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কিছুকাল ধরিয়া যে পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহা সফল হইয়াছে। কোনো প্রকার নিশ্চেতনক ব্যবহার করিয়া গাছের নিদ্রার মাত্রা পূর্ণ করিয়া দিয়া গাছকে বৃদ্ধির সময়ে সজাগ করিতে পারিয়াছেন। ঈথর এবং ক্লোরফরম্‌ প্রয়োগে নিদ্রিতের সমস্ত লক্ষণই উদ্ভিদে দৃষ্ট হয়, ইহা প্রয়োগে বৃক্ষের বিশ্রাম কাল সংক্ষেপ করিয়া শীঘ্র মুকুলিত করিবার চেষ্টা যথার্থই সফল হইয়াছে।

গ্রীষ্মের শেষভাগে যখন পাতাগুলি সব ঝরিয়া যায় নষ্ট তখন লাইলাক্‌ নামক পুষ্পের একটী গুচ্ছকে মাটি হইতে তুলিয়া ঈথর প্রয়োগে কয়েক ঘণ্টা রাখিলে গাছের এমন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় যাহা স্বভাবত ঘটিতে মাসাধিক লাগে। আগষ্টের শেষভাগে লাইলাক্‌ গাছে ঈথর প্রয়োগ করিলে একবার জুন মাসে আর একবার নভেম্বরে অনায়াসে ফুল ফোটান যাইতে পারে।

যে গাছে ঈথর প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার পাতা ও শিকড়কে সম্পূর্ণ ভাবে শুকাইয়া রুদ্ধবায়ু কোনো আধারের মধ্যে রাখিতে হয়। তাহার দরজা বন্ধ রাখিয়া ছাদে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ভিতরের পাত্রে ঈথর ঢালিয়া দেওয়া হয়, এবং ঈথরের বাষ্প বায়ু হইতে ভারি বলিয়া গাছের উপর আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ ঈথরের পরিবর্ত্তে আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিতে বলেন। বৈদ্যুতিক আলোর উত্তেজনায় ফুলের চাষ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাহায্য করিলেও ইহার রাসায়নিক অতি-ভায়লেট্‌ রশ্মিগুলি গাছপালার পক্ষে হানিকর। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৈজ্ঞানিক আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ইহার সঙ্গে সূর্য্যের আলোর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিয়া যথাসময়ের ১৬ দিন পূর্ব্বে ষ্ট্রবেরি, তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে জেরেনিয়ম্‌ মুকুলিত করা হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কল্পনা ও কল্পনাতীত।

কল্পনা মায়ার রাজ্য স্বপনের প্রায়
ওঠে পড়ে ভাঙ্গে গড়ে ছায়াতে মিলায়;
তাহার আনন্দ কভু নাহি রহে স্থির,
অনিত্য জানিয়া তাবে তেয়াগেন ধীর।
যদিও জীবন-চক্র কল্পনা-গঠিত,
আপনার কল্পনায় আপনি জড়িত,
তথাপি রহে না তার কল্পনার ভান
হেরিলে সত্যের জ্যোতি হয়ে আত্মবান।
যদিও কল্পনা-সূত্রে গ্রথিত সংসার,
কল্পনা সংযোগে তার রচনা-বিস্তার,
তথাপি করিয়া এই কল্পনার শেষ
বিরাজে সত্যের রূপ জিনি কাল দেশ।
ঘুচি গিয়া কল্পনার বিচিত্র বন্ধন
কল্পনা-অতীতে হেরি মুক্ত হয় মন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

নিবেদন।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদনাধীনে নূতন ভাবে বাহির হইতেছে, ইহাতে ব্যয় পূর্ব্বের দ্বিগুণ হইতেও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট অক্ষরে ছাপা হইতেছে বলিয়া অধিক প্রবন্ধ যাইতেছে। ইহার উপরে আকারে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে;—পূর্ব্বে পত্রিকা চারি ফর্ম্মা মাত্র হইত, এ মাসে সাড়ে সাত ফর্ম্মা হইল। এই ব্যয়াধিক্যেও আমাদের ভয়ের কোনো কারণই নাই যদি গ্রাহকমহাশয়গণ আমাদের আনুকূল্য করেন। তাঁহারা নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে আমরা অনেক সাহায্য লাভ করিব। অনেক গ্রাহকের নিকটেই পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য আছে। পূজাবকাশ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন আমাদিগকে সমস্ত দেনা পাওনা মিটাইতে হইবে; এই সময়ে যাঁহাদের নিকটে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য আছে, আশাকরি তাঁহারা সকলে স্ব স্ব দেয় চুকাইয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা
১লা ভাদ্র, ১৩১৮।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প

প্রথম ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৭ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদান্তবাদ।

তৃতীয় প্রপাঠক

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ

১

শ্রীনিম্বার্কদর্শন

(ক)

আমি আমার পূর্ব্ব প্রপাঠকে বেদান্তের মূল পাঁচটি শাখা বা সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, যথা, (১) শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ; (২) রামানুজাচার্য্য ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (৩) বিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (৪) মধ্বাচার্য্যের ও বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বৈতবাদ, এবং (৫) নিম্বার্কাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ইহা ভিন্ন বিজ্ঞান ভিক্ষুর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ও বিশ্বদেবাচার্য্যের নিবঞ্জন ভাষ্যের কথাও বলিয়াছি। আজ আমরা দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ-বাদ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব। নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য উভয়েই দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী, কিন্তু পরস্পরের মতভেদ আছে, ইঁহারা উভয়েই বিভিন্ন বিভিন্ন প্রণালীতে স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশ উভয় প্রণালীই আলোচনা করিয়া দেখিব; অদ্য নিম্বার্কেরই মত আলোচিত হইবে।

এই স্থানে এই দর্শনের পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদে চিৎ অর্থাৎ চেতন, অচিৎ অচেতন জড় ও ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই তিনটি পদার্থ প্রধানতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোনো কোনো স্থানে ঐ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের পরস্পর স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে; আবার কোনো স্থলে দেখা যাইবে যে, চিৎ ও অচিতের ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ ঐক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করায় ঐ উভয় জাতীয় বাক্যের মধ্যে কোনোরূপ বাধ্যবাধকভাব সম্বন্ধ আছে মনে করা যাইতে পারে; কেহ মনে করিতে পারেন যে, এক জাতীয় বাক্যই প্রমাণ, অপর জাতীয় বাক্য প্রমাণ নহে, এক জাতীয় বাক্য অপর জাতীয় বাক্যের অর্থকে বাধিত করিবে; অথবা ইহাও কেহ মনে করিতে পারেন যে, এক জাতীয় বাক্য মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে, অপর জাতীয় বাক্য গৌণ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেননা, উভয় জাতীয় বাক্যেরই বল সমান; উহাদের মধ্যে যদি কোন প্রবল-দুর্ব্বল ভাব থাকিত তবে তাদৃশ কল্পনা চলিত, কিন্তু বস্তুত তাহা বলিতে পারা যায় না; কে বলিতে পারিবে যে, এই সকল বাক্য প্রবল, এবং ঐ সকল দুর্ব্বল? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ উভয়বিধ বাক্যই স্ব স্ব প্রতিপাদ্য অর্থে প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই বলিতে হয় যে, চিৎ ও অচিতের সহিত ব্রহ্মের স্বা ভা বি ক ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। এই জন্যই এই মতের নাম ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত। ইঁহারা বলেন উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈতাদ্বৈত-মতই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং এই-রূপেই ইঁহারা তৎসমুদয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভেদ প্রতিপাদক ও অভেদ প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতিস্মৃতিবচন ইহাঁরা সাধারণত উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাদের কয়েকটি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহারা যে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব বা পদার্থ স্বীকার করেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণত এই বচনদ্বয় উল্লেখ করিয়া থাকেন :—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥" * শ্বেতা· ১· ১২।"
"প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতিগুর্ণেশঃ।" † শ্বেতা· ৬·১৬।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ঐ তিন তত্ত্বের পরস্পর বৈলক্ষণ্য বা ভেদ প্রকাশ করিতেছে :—

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোঽন্যঃ ॥" ‡ শ্বেতা· ৪·৫।
"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥" § মুণ্ড· ৩· ১· ১।
"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" ¶ শ্বেত· ১·৯।

ইত্যাদি। ॥ স্মৃতি বচনও এইরূপ অনেক আছে, যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ** গীতা·১৫· ১৬-১৭ ইত্যাদি। ††

* ভোক্তা জীব, ভোগ্য জড় জগৎ, ও ইহাদের প্রেরিতা প্রেরক ঈশ্বরকে মনে করিয়া এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে।

† প্রধান অব্যক্ত, প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, তাহাদের পতি; ও গুণেশ গুণ সমূহের ঈশ।

‡ একটি অজ (জীব) প্রীত হইয়া তাহাকে সেবা করে, এবং অপর অজটি (পরমাত্মা) ভুক্তভোগা (প্রকৃতিকে) ত্যাগ করে।

§ সর্ব্বদা একসঙ্গযুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবপ্রাপ্ত দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাদুফল ভক্ষণ করে অপরটি ভোজন না করিয়া দর্শন করে।

¶ দুইটি অজের মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ; একটি ঈশ, অপরটি অনীশ।

॥ কঠ. ৫. ১৩, শ্বেতা· ৬. ১৩; শ্বেতা. ৬. ১৬; শ্বেতা. ১. ৬; চূণ. ৬।

** লোকে অর্থাৎ সংসারে এই দুইটি পুরুষ অর্থাৎ রাশি আছে, একটি ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী, আর একটি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী; ক্ষর বলিতে এই সমস্ত ভূত এবং কূটস্থ অর্থাৎ নিত্যকে অক্ষর বলা হয়। ইহা ছাড়া অপর এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইহাকে পরমাত্মা বলা হয়, ইনি অব্যয়-অক্ষয় ঈশ্বর, ইনি লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

†† "তত্র যঃ পরমাত্মা তু স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ কর্ম্মবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ॥"

আবার এই সকল বাক্যে অভেদ প্রকাশিত হইতেছে :—"সদেব সোম্যেদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," "তত্ত্বমসি," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "তদাত্মানমেবাবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মি," "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি।"

এখন এই চিৎ ও অচিৎ হইতে ব্রহ্ম কিরূপে ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারেন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের এ সম্বন্ধে যুক্তি কি, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইহাঁরা বলেন--আমরা জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য স্বীকার করি না; কেন না, জীবের স্বরূপ অন্য, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ অন্য। চেতন ও অচেতনের স্বরূপ অন্য, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ অন্য। চেতনের (অর্থাৎ জীবের) স্বরূপ অণু, অচেতনের স্বরূপ স্থূল, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ স্থূলও নহে, অণুও নহে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি অস্থূল অনণু।

আবার শ্রুতিতে বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মা, সকলের নিয়ন্তা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার সত্তা স্বতন্ত্র—স্বাধীন, পরতন্ত্র নহে, এবং তিনি সকলের আধার। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, এই চেতনাচেতনময় জগৎ ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্মই ইহার আত্মা, ব্রহ্মেরই দ্বারা ইহা নিয়মিত হয়, ব্রহ্মেরই দ্বারা ইহা ব্যাপ্ত, এবং ইহার সত্তা ব্রহ্মেরই অধীন, এবং ইহা ব্রহ্মেই আধেয় ভাবে রহিয়াছে।

অতএব যদিও ব্রহ্ম চিৎ-অচিৎ হইতে স্বরূপত ভিন্ন, তথাপি এই সকল কারণে তাঁহাকে চিৎ-অচিৎ হইতে অভিন্নও বলা যাইতে পারে। একটু স্পষ্ট করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম সকলের আত্মা, এবং চিদচিন্ময় এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক। ঘট যেমন মৃত্তিকাত্মক বলিয়া ঘটকে মৃত্তিকা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাও ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্ম জগতের নিয়ন্তা, এবং জগৎ নিয়ম্য। দেখা যায়, যে যাহার নিয়ম্য তাহা তাহার নামে অভিহিত হয়; জীবের শরীর জীবের নিয়ম্য বলিয়া জীব ও শরীরের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম নিয়ন্তা এবং জগৎ নিয়ম্য বলিয়া ব্রহ্ম ও জগতের অভেদ নির্দ্দেশ হইতে পারে। ব্রহ্ম ব্যাপক এবং জগৎ ব্যাপ্য। যেমন অগ্নি ব্যাপক এবং ধূম ব্যাপ্য বলিয়া অগ্নি ও ধূমের অভেদ ব্যবহার হয়, (ধূমবিশিষ্ট অগ্নিকেও কেবল 'অগ্নি' বলা হয়), ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই জগতের সত্তা ব্রহ্মের অধীন, ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যে যাহার অধীনে থাকে, তাহাকে তাহার নামে অভিহিত করা যায়। উপনিষদেই পাওয়া যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণের অধীন বলিয়া ঐ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণ নামেই নির্দ্দিষ্ট করা হই-

য়াছে। * আবার ব্রহ্ম জগতের আধার, এবং জগৎ আধেয়। এই আধারাধেয় ভাব সম্বন্ধেও কোনো কোনো স্থলে অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে; যেমন কোন ভৌতিক পদার্থ নিজের অধিকরণরূপ মূল ভূতের সহিত অভেদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, চেতনাচেতনময় জগৎ ও ব্রহ্মের এই অভেদ পূর্ব্বোক্তরূপে মুখ্য বলিতে পারা যায় না, ইহা গৌণ অভেদ হইতে পারে। নিয়ম্য নিয়ামক ভাব প্রভৃতি কয়েকটি হেতুতে এইরূপ গৌণ অভেদ সম্ভাবিত হইলেও সর্ব্বত্র এইরূপ হইতে পারে না। জীব শরীরের নিয়ামক ও শরীর তাহার নিয়ম্য; এক্ষণে জীব ও শরীরের যে অভেদ ব্যবহার তাহা কখনই মুখ্য নহে, ইহা গৌণ অভেদ মাত্র। অন্যত্র কয়েকটি হেতু সম্বন্ধেও এইরূপ বলিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম হেতু সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকাত্মক বলিয়া ঘটের যেমন মৃত্তিকার সহিত অভেদ স্বাভাবিক, জগৎও তেমনি ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাঁহার সহিত জগতের যে অভেদ, তাহা স্বাভাবিক, এবং মুখ্য। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, এবং সেই জন্যই জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হয়। ইহা পরে আরো বিবৃত হইবে। আরও ইহার উত্তরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন :—দ্রব্য সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক, এবং ঘট, পৃথিবী প্রভৃতি বিশেষ অর্থাৎ ব্যাপ্য; এস্থলে যেমন আমরা 'ঘট দ্রব্য' 'পৃথিবী দ্রব্য' ইত্যাদি ব্যবহারে ঘট ও দ্রব্যের মুখ্য অভেদই গ্রহণ করিয়া থাকি, কেননা, বিশেষ সামান্যের সহিত অভিন্ন, চেতনাচেতনময় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ; সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতি-অনন্তগুণশালী ও অসীমশক্তিবৈভবযুক্ত ব্রহ্ম সামান্য বা ব্যাপক, এবং চেতনাচেতনময় জগৎ বিশেষ বা ব্যাপ্য; ঐ ব্রহ্মই জগতের আত্মা-প্রকৃতি ও অন্তরাত্মা-অন্তর্যামী; অতএব ব্রহ্মই যাহার প্রকৃতি ও অন্তরাত্মা, সেই চেতনাচেতনময় জগতের অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহা সুস্পষ্ট। অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম, এই অভেদ ব্যবহার মুখ্যই বলিতে হইবে।

ইঁহারা চিদচিৎ ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য বা অভেদ প্রতিপাদনের জন্য যে সকল হেতু প্রদর্শন করেন, তৎসমুদয়কে প্রধানত তিনটির মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়; যথা—(১) প্রথম, চিদচিৎ জগৎ ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্মাত্মকত্ব); (২) দ্বিতীয়, ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি ব্রহ্মের অধীন (তদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্ব); এবং (৩) তৃতীয়, ইহা ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত (তদ্ব্যাপ্যত্ব)। *

এই ত্রিবিধ হেতু স্বকপোলকল্পিত নহে, শ্রুতি ও ও স্মৃতিতেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্রেও তাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহা জানা যাইবে। "এই তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত;" † "ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা;" ‡ "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা;" § "হে গুড়াকেশ, আমি সর্ব্বভূতের আশয়স্থিত আত্মা;" ¶ "আত্মা বলিয়া (ইঁহাকে) স্বীকার করেন ও গ্রহণ করান;" ‖ "হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজার মূল সৎ, ইহাদের আশ্রয় সৎ, এবং সতেই ইহারা প্রতিষ্ঠিত;" ** "আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতে সমস্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে;" †† "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা;" ‡‡ "তুমি একাই এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থান ব্যাপ্ত করিয়াছ;" §§ "এই জগতে যাহা দেখা বা শুনা যায়, তৎসমুদায়ের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ ব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ রহিয়াছেন;" ¶¶ ইত্যাদি।

তাঁহারা আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—সত্তা দ্বিবিধ; স্বতন্ত্রসত্তা ও পরতন্ত্রসত্তা। যেখানে স্থিতি ও প্রবৃত্তি স্ব অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত, সেখানে তাহারই নাম পরতন্ত্র সত্তা; এবং যেখানে ঐ স্থিতি ও প্রবৃত্তি পরের আয়ত্ত, সেখানে তাহা পরতন্ত্র সত্তা। স্বতন্ত্র সত্তা কেবল বিশ্বাত্মা পরব্রহ্মেই আছে। "হে সোম্য, পূর্ব্বে ইহা একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল," ‖‖ ইত্যাদি শ্রুতি প্রভৃতিতে পরব্রহ্মই তাদৃশ স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় বলিয়া জানা যায়। পরতন্ত্রসত্তা ব্রহ্মের নিয়ম্য চেতনাচেতনময় সমস্ত পদার্থে রহিয়াছে। "যাহা ছিল তাহা তাঁহার অধীন ছিল," *†

---

* ছান্দো. ৫. ১. ৬-১৫;—"(সেই বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে লোকেরা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) বলে না, চক্ষু বলে না, শ্রোত্র বলে না, এবং মনও বলে না, তাহারা (তৎসমুদয়কে) "প্রাণ" এই মাত্র বলিয়া থাকে; কেন না এই সমস্তই প্রাণ।' তুলঃ—বৃহ.৬. ১. ৭-১৪।

* বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২২-২৩ পৃ; বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ৮৮ পৃ; বেদান্তকৌস্তুভ (শ্রীনিবাসভাষ্য) ১. ১. ১, ১৮পৃ ২. ৩, ৪২, ৬৯৫ পৃ; বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা ২. ৩, ৪২।

† বৃহ. ৩-৭৩।

‡ মুণ্ডক, ২, ১, ৪।

§ শ্বেতা, ৬, ১।

¶ গীতা, ১০, ২০।

‖ বে, সূ, ৪, ১, ৩।

** ছান্দো, ৬, ৮, ৪।

†† গীতা, ১০, ৮।

‡‡ শ্বেতা, ৬, ১।

§§ গীতা, ১১, ২০।

¶¶ বিষ্ণু. পু. (?)।

‖‖ ছান্দো. ৬. ২. ১।

*† বেদান্ত রত্নমঞ্জুষা (৯০ পৃ.) ধৃত শ্রুতি।

ইত্যাদি শ্রুতি ও "আমা হইতেই সমস্ত প্রবৃত্ত হয়" * ইত্যাদি স্মৃতির দ্বারা ইহা জানা যায়।

এই পরতন্ত্রসত্তা আবার দ্বিবিধ; কূটস্থত্ব ও বিকারশীলতা। যাহার জন্মাদি বিকার নাই এবং যাহা নিত্য, তাহাকে কূটস্থ বলা হয়, এবং তাহার ধর্মের নামই কূটস্থত্ব। এই কূটস্থত্ব জীবে রহিয়াছে। জীবের জন্মাদি বিকার নাই, ইহা নিত্য, এবং ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি উভয়ই পর-অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের আয়ত্ত, নিজের আয়ত্ত নহে। এই জন্য কূটস্থত্ব রূপ পরতন্ত্রসত্তা জীববর্গে থাকে। এই জীবকে সময়ে সময়ে প্রত্যক্ অক্ষর, পুরুষ, ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিকারশীলতারূপ পরতন্ত্রসত্তার লক্ষণ এই যে, এই সত্তাও পর-অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের আয়ত্ত, কিন্তু ইহা যাহাতে থাকিবে তাহা অবিকারী নহে, ইহার বিক্রিয়া আছে, কিন্তু ইহার আদি বা অন্ত নাই। এই সত্তা অচেতন বা জড়বর্গে রহিয়াছে। কার্য্যকারণ রূপে এই অচেতনবর্গকে প্রধান প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

এইরূপে অভেদবাচক, ভেদনিষেধক ও ভেদবাচক এই ত্রিবিধ শ্রুতিরই সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া থাকে, এই ত্রিবিধ শ্রুতিরই স্ব স্ব বিষয় প্রতিপাদনে প্রামাণ্য থাকে। যে সমস্ত শ্রুতি অভেদ-বা অদ্বৈত-বাচক, তাহারা ব্রহ্মের যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহাই প্রতিপাদন করে; যে সমস্ত শ্রুতি ভেদনিষেধক, তাহারা এই প্রতিপাদন করে যে, চেতনাচেতনময় বিশ্বের স্বতন্ত্রসত্তা নাই; আর যে সমস্ত শ্রুতি ভেদবাচক, তাহারা চেতনাচেতনময় বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তা প্রকাশ করে। অভেদবাচক শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের স্বতন্ত্রসত্তা প্রতিপাদন করিয়া এই প্রকাশ করে যে, ব্রহ্ম নিজাশ্রিত স্বতন্ত্রসত্তায় (সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া) সমস্ত বিশ্ব হইতে অভিন্ন। ভেদবাচক শ্রুতিসমূহ বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তা প্রকাশ করিয়া এই প্রতিপাদন করিতেছে যে ব্রহ্মনিয়ম্য চেতনাচেতনরূপ বিশ্বে যে পরতন্ত্রসত্তা আছে তাদৃশ বিশ্বের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে সেই পরতন্ত্রসত্তা নাই, প্রত্যুত তাঁহাতে বিশ্বের বৈলক্ষণ্যই (ভেদই) রহিয়াছে,—তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম রহিয়াছে, এই সকল ধর্ম্মকেই 'অস্থূল' প্রভৃতি পদে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব এতাদৃশ বিশ্ব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া ভেদাভেদবাদিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন—সর্প ও সর্পের কুণ্ডল (অর্থাৎ কুণ্ডলী) সকলেই দেখিয়াছেন। এখানে কুণ্ডল ও সর্পে পরস্পর ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। সর্প কুণ্ডলের উপাদানভূত কারণ, এবং কুণ্ডল তাহার কার্য্য। সর্প স্বাধীন, কুণ্ডল পরাধীন; সর্প ব্যাপক, কুণ্ডল ব্যাপ্য। এই জন্য সর্প ব্যাপক, কুণ্ডল ব্যাপ্য। এই জন্য সর্প ও কুণ্ডলকে পরস্পর হইতে একবারে ভিন্ন বা একবারে অভিন্ন বলা যায় না, উহাদিগকে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলা সঙ্গত। এবং তাহাদের ঐ ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক। ব্রহ্ম ও জড় জগৎ এইরূপ। এই কথাকেই আর এক জন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—সর্প সর্পই, এবং কুণ্ডল কুণ্ডলই, এইরূপে আমরা সর্প ও কুণ্ডল উভয়ের ভেদ স্পষ্টই দেখিতে পাই। আবার যখন দেখি কুণ্ডল সর্প হইতে পৃথক্ নহে, কুণ্ডল সর্পাত্মকই, তখন উভয়ের অভেদও স্পষ্ট দেখিয়া থাকি। সর্প যখন লম্বা হইয়া থাকে, তখন কুণ্ডল সূক্ষ্মাবস্থায় তাহাতেই থাকে, তাহার কেবল নাম ও রূপ ব্যক্ত থাকে না; এবং তাহা সেইরূপ থাকে বলিয়াই অপর সময়ে আবার তাহা আবির্ভূত হইতে পারে; তাহা না হইলে, ঐ কুণ্ডল সূক্ষ্মভাবে তাহাতে না থাকিলে আবার আবির্ভূত হইতে পারে না। অতএব স্থূলাবস্থায় কুণ্ডলের সর্প হইতে ভেদ, এবং সূক্ষ্মাবস্থায় অভেদ স্বাভাবিক। জগৎও এইরূপ স্থূলাবস্থায় ব্যক্তনামরূপ হইয়া থাকে। তখন ইহার কারণ ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন; এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহা হইতে অভিন্নও। বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অব্যক্তাবস্থায় জগৎ সূক্ষ্মরূপে নিজের কারণ ব্রহ্মেই থাকে। অতএব ব্যক্ত অব্যক্ত উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আবার সূর্য্যাদির সহিত তদীয় প্রকাশের যেরূপ স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয় থাকে জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক। এইরূপে ব্রহ্ম সমস্ত হইতে স্বভাবত ভিন্ন ও অভিন্ন হওয়ায় তাঁহাকে সর্ব্বভিন্নাভিন্ন বলা হয় এবং এই জন্যই বিশ্ব হইতে ব্রহ্মে স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকাতেই এই মতের নাম ভেদাভেদবাদ হইয়াছে; ইহারই অপর পর্য্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

ভাস্করাচার্য্যও ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভেদাভেদ নিম্বার্কের ন্যায় স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক; ইহা ভাস্কর-দর্শন আলোচনার সময় সবিশেষ বিবৃত করা হইবে। শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ডে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—

"নিম্বার্কভাস্করাচার্য্যৌ ভেদাভেদনিরূপকৌ॥
তত্রাদ্যানাং বাস্তবঃ স ভাস্করাণামুপাধিতঃ॥"

অতএব নিম্বার্কের দর্শন স্বাভাবিক ভেদাভেদ, এবং ভাস্করাচার্য্যের দর্শন ঔপাধিক ভেদাভেদ; এই

* গীতা, ১০।৮।

বলিয়া উঁহাদের পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করিতে হইবে।

ব্রহ্ম যে এইরূপে সমস্ত হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই তদ্বিষয়ে ইঁহারা এই সকল ঘটক (অর্থাৎ তাদৃশ সিদ্ধান্ত-সম্পাদক) শ্রুতি ও স্মৃতির বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন :—"তিনি এক হইয়া বহু প্রকারে বিচরণ করিয়াছিলেন," * "তুমি এক (কিন্তু) বহুরূপে বহুর মধ্যে প্রবিষ্ট," † "এক দেব বহুভাবে সন্নিবিষ্ট," ‡ "একত্ব হইলে নানাত্ব, এবং নানাত্ব হইলে একত্ব, ব্রহ্মের সেই অচিন্ত্য রূপ কে জানিতে পারে?" § "একত্ব ভাবে পৃথক্ত্বভাবে, ও বহুভাবে আমাকে উপাসনা করে," ¶ "পৃথগ্ভূত ও একভূত তোমাকে নমস্কার," ‖ ইত্যাদি। **

অদ্বৈতবাদীরা এখানে একটা কথা তুলিতে পারেন :—ব্রহ্মে যদি চেতনাচেতনময় বিশ্বের স্বাভাবিক অর্থাৎ বাস্তব ভেদাভেদ থাকে, তবে সেই বিশ্বের একটা বাস্তব সত্তা আছে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু তাহা হইলে "এখানে কিছু নানা নাই" †† ইত্যাদি নানাত্ব-নিষেধক শ্রুতির গতি কি? ইঁহারা বলেন ঐ শ্রুতি দ্বারা বিশ্বের নানাত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না, বিশ্বের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই নানাত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মের নানাত্ব-দর্শন দূরে থাকুক, তাঁহাকে যে নানার ন্যায় ("নানেব") দর্শন করে, সেও মৃত্যুর পর আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করে।

আরো একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নানাত্ব-নিষেধক শ্রুতি কাহার নিষেধ করিতেছে? তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় না। কোনোরূপে প্রাপ্ত বিষয়েরই নিষেধ হইয়া থাকে, অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধ হইতে পারে না। অর্থাৎ কোনো প্রকারে যদি একটা কিছু থাকে, তবে 'তাহা নাই' বলিতে পারা যায়। কেহ যদি কিছু খাইতে যায়, খাওয়ার জন্য তাহার কোনোরূপে প্রবৃত্তি হইলে বা সম্ভাবনা থাকিলে 'খাইও না' বলিয়া নিষেধ করা যায়। অতএব এইরূপে বলিতে হয় যে, প্রাপ্ত বিষয়েরই নিষেধ হইয়া থাকে, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এখন নানাত্বনিষেধক শ্রুতি যদি ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর নিষেধ করে, তবে সেই বস্তু হয় প্রাপ্ত না হয় অপ্রাপ্ত হইবে। যদি তাহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর যদি কোনোরূপে উপস্থিতি থাকে, তবে তাহা হয় সত্য না হয় অসত্য। তাহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি না; কেন না, সত্য হইলে তাহাকে আর নিষেধ করিতে পারা যায় না যে, 'তাহা নাই।' সত্যেরও যদি নিষেধ হয়, তবে সত্যরূপ ব্রহ্মেরও নিষেধ আসিয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইল নিষেধশ্রুতি যাহার নিষেধ করিতেছে, তাহা অসত্য। কিন্তু বস্তুত আমরা তাহাকে অসত্য বলিতে পারি না; কেন না, অসত্য হইলে তাহার প্রাপ্তি বা উপস্থিতিই হইতে পারে না, এবং প্রাপ্তি না থাকিলে তাহার নিষেধও হইতে পারে না।

ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, যেমন শুক্তিরজতস্থলে বস্তুত রজত না থাকিলেও অধ্যস্ত বা আরোপিত রজতকে 'ইহা রজত নয়' এই বলিয়া নিষেধ করা হয়, এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মভিন্ন বস্তু এই জগৎ বস্তুত না থাকিলেও অধ্যস্তরূপে মিথ্যাভূতরূপে থাকে, এবং এইরূপেই তাহার প্রাপ্তি থাকে ও তাহার নিষেধও হইতে পারে। * ইহা কেন বলা যায় না তাহা দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। শুক্তিতে যেমন রজতের অধ্যাস বা আরোপ হয়, ব্রহ্মেও সেইরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগতের অধ্যাস ইহাই অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রায়; কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ অধ্যাসের পাঁচটি কারণ আছে; যথা, যাহাতে কোন বস্তুর অধ্যাস হইবে তাহা (১) সাবয়ব ও (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে, (৩) এবং যে বস্তু তাহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইবে তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকা চাই; আবার যে ব্যক্তি অধ্যাস করেন, তাঁহার (৪) সাক্ষাৎ বা পরম্পরা যে কোন সম্বন্ধেই হউক ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকা চাই, † (৫) এবং যে বস্তুকে তিনি অধ্যাস করিবেন, সেই বস্তুটি তাঁহার পূর্ব্বে অনুভূত হওয়া আবশ্যক,—তাঁহার সেই বস্তুর অনুভবজনিত একটি সংস্কার থাকা আবশ্যক। শুক্তিরজত স্থলে এ সমস্তই থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বলিবার সময় আমরা সেই সমুদয় কারণ দেখিতে পাই না। জগৎ যদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রহ্মকে (১) সাবয়ব, ও (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

---

* "এ কঃ সন্ বহুধা বিচচার।"

† "ত্বম্ একোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ।"

‡ একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।

§ মনু।

¶ একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্"—গীতা, ৯. ১৫।

‖ "পৃথগ্ভূতৈকভূতায়,"—বিষ্ণুপুরাণ ১. ১২. ৭০।

** বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২৬ পৃ।

†† বৃহ. ৪. ৪. ১৯; কঠ. ৪. ২১।

* বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২৬ পৃ।

† চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বভাবত অপটুতা সাক্ষাৎ দোষ; আলোকাদির অস্পষ্টতা, বা কোন রোগাদি প্রভাবে বস্তুকে যথাযথ গ্রহণের অশক্তি পরম্পরা দোষ বলিয়া এখানে ধরা হইয়াছে।

হইতে হইবে, এবং (৩) তাহাতে জগতের সাদৃশ্য থাকিবে; কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম ঈদৃশ নহে, কেন না, তাঁহারা নিজেই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয় ও নিগুর্ণ। * আবার (৪) দোষ, ও (৫) সংস্কারও কাহারো দেখা যায় না। অধ্যাস করিবে কে? জীব ভিন্ন আর কেহ নহে; কিন্তু জীবে ঐ উভয়ই নাই; কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন জীব ত তাঁহারা স্বীকারই করেন না। অপর কোন জীবই ত তখন নাই, কেবল অধ্যাসের অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্মমাত্র রহিয়াছে; জীবও ত ভ্রমের কার্য্য, অতএব ভ্রম হইবার পর জীব থাকিতে পারে। †

ভেদাভেদবাদিগণ এইরূপ বিপুল তর্কের দ্বারা অদ্বৈত-বাদিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের প র প ক্ষ-গি রি ব জ্র নামক গ্রন্থখানিতে অতি গভীর তর্কযুক্তি দ্বারা অধ্যাসবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এখানে অনাবশ্যক মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে আর কিছু উদ্ধৃত হইল না। ‡

শ্রীমধ্বাচার্য্যমতাবলম্বী দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, চেতন ও অচেতন হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভেদবাচক শ্রুতি-সমূহ ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তাহাই যথার্থ। অভেদবাচক শ্রুতিসমূহ চেতন ও অচেতনের সহিত ব্রহ্মের অভেদ প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে; ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বাস্তব অভেদ বুঝাইতেছে না। চন্দ্র ও মুখের পরস্পর সাদৃশ্য থাকায় যেমন মুখকেই চন্দ্র বলা হয়, তাহাদের অভেদ ব্যবহার হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও চেতনা-চেতনময় প্রপঞ্চের কোন একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই 'ইহা সমস্তই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অভেদ শ্রুতিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন 'মুখই চন্দ্র' এই অভেদ ব্যবহার স্থলে মুখ ও চন্দ্র উভয়ের সৌন্দর্য্যরূপ সাদৃশ্য থাকে, ব্রহ্ম ও চেতনাচেতন জগতেরও সেইরূপ সত্তা-রূপ সাদৃশ্য আছে; অর্থাৎ যেমন মুখও সুন্দর চন্দ্রও সুন্দর, সেইরূপ ব্রহ্মও সৎ জগৎও সৎ। অতএব সত্তারূপ সাদৃশ্যেই ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ এবং তাহা হইলেই এই অভেদ গৌণ মাত্র, মুখ্য নহে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ইঁহাদের এই মতকে সাধারণত এই বলিয়া পরিত্যাগ করেন যে, সমস্ত শ্রুতিই সমান; ইঁহাদের প্রবল দুর্ব্বল ভাব নাই; এক জাতীয় শ্রুতি মুখ্য অর্থ এবং আর এক জাতীয় শ্রুতি গৌণ অর্থ প্রকাশ করিবে, তাহা বলিতেই পারা যায় না।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* নিগুর্ণ বলিয়া সাদৃশ্যরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকিতে পারে না।

† বেদান্ততত্ত্ববোধ, ১৪পৃঃ।

‡ বেদান্তকৌস্তুভপ্রভাতেও (১. ১. ১; ৩০ পৃঃ) বিশেষ অধ্যাসখণ্ডন আছে।

যিশু চরিত। *

বাউলসম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা সকলের ঘরে খাও না?" সে কহিল, "না।" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।" আমি কহিলাম "তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?" সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল "তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।"

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখাদ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো না কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদি-গকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসংস্কা-রকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহা-পুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি— আপনাকেই ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবের দিনে কথিত বক্তৃতার মর্ম্ম।

সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চ্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র, এদেশে ধর্ম্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দুসমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল—স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সঙ্কট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ্ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচাররূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্য্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিপদ আমাদের পূর্ব্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না কিন্তু আমাদের অহঙ্কার বাড়িল। পূর্ব্বে এক দিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহঙ্কারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জ্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্ব্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জ্জীবতাই যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালও যেমন, মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি। জীবনের ধর্ম্মই নির্ব্বাচনের ধর্ম্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জ্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাল, তাহার কিছুই বর্জ্জনীয় নহে ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না—কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলতঃ চরিত্রের দুর্ব্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না;—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্দ্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্ম্মবুদ্ধি

চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই,—যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিলে সমস্ত কৃত্রিমতা, কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্ব্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জালবুনানীর মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্ত্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড় সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি;—স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব-চিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখ কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়োনা, আঘাত করিয়োনা, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়োনা, তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়োনা। সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্ত্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহবা দাস্যবৃত্তি, কেহবা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন

করিয়া সমস্ত জীবন ব্যাপাইয়া দেয়, একমুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যেদিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরব-চূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিয়েছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও ঐশ্বর্য্য শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারিদিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র য়িহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোমসাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের যেমন প্রবল মূর্ত্তি, য়িহুদি সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

য়িহুদিদের ধর্ম্ম স্বজাতির গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোবা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কঠিন ও সঙ্কীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু য়িহুদিদের সনাতনআচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্ম্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি য়িহুদি ঋষিগণ পরম দুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্রজ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে তাহাদের বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্ম্মের দ্বারাই য়িহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতি লাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে য়িহুদিদের সমাজে ঋষিঅভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া বেড়াবাঁধিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসঙ্কলিত তালমুদ্ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম্ম-পালনের মূলে যে একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে য়িহুদিরা আপনাপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র য়িহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেককারী যোহন্ যখন য়িহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। য়িহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি ত রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজ-প্রভাব না থাকিলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন করিবে কি করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, সয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজ-গৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত

য়িহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই সর্ব্বত্রব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্যউপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক্ দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; "যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।" "ধীরাঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাহা সর্ব্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। যেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না; যেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র, আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্ত্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন, মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকাররক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই সয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা, তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর, আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে মানকে দেখে, তখনি আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আচারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না, কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই; যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তাহার শক্তিহ্রাস হয় এবং সে কেবলি ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলিনৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত

গ্রহণ করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সঙ্কীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া নৈবেদ্য দিয়া বস্ত্র দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক্ তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চ্চনাদ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দূর দেশ দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন —কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে; কারণ, এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুণে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন সমস্ত মনুষ্যের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখ বহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। দুর্ব্বলের নির্জ্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কারের গৌরব নহে —কারণ অহঙ্কারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক—তাহার নিজের মধ্যে স্বত উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না—তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মত নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ব্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে—শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্ব্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার গৃহে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সঙ্কোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপে নব ধর্ম্মান্দোলন।

ইউরোপের নব ধর্ম্মান্দোলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলেই রামমোহন রায়ের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কত আগে যে ইহার পূর্ব্বসূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সে কথা ইউরোপ জানে না এবং আমাদের দেশের লোকে সম্ভবতঃ আরও কম জানে।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে তিনি তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের একটা আলোচনা মাত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের সার সার সত্যগুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের পরস্পরের ঐক্য তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়কে এমন করিয়া দেখিলে অত্যন্ত

ক্ষুদ্র করিয়া দেখা হইবে। অবশ্য জগতের কোন সভ্যতার এমন কোন দিক্ ছিল না যাহা রামমোহন রায়ের জানা ছিল না। ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, আইন, অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রবেশ ছিল। তথাপি তাঁহাকে একজন আশ্চর্য্য মনস্বী মাত্র মনে করা ভুল। তাঁহার এ পাণ্ডিত্য তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্গত ছিল। ইহা পাষাণস্তূপের মত তাঁহার জীবনের উপরে ভারের মত চাপিয়া ছিল না বরং হিমাচলের উত্তুঙ্গ তুষাররাশির ন্যায় নানা ভাবের নদীতে নিঃস্রুত হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

রামমোহন রায় ভিন্ন আর একজন মানুষের নাম আমরা করিতে পারি না যাঁহার অধ্যাত্ম সাধনা এমন বিশ্বানুপ্রবিষ্ট এবং সকল দিক দিয়া এমন পরিপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনা চিরদিনই অন্তর্মুখীন ও ভাবপ্রধান। এদেশে কি জ্ঞানপন্থী কি ভক্তিপন্থী সকলেই আপনার ব্যক্তিগত ভাবের ভিতরেই সেই পরমপুরুষকে দর্শন করিতে চায়—বিশ্ব জগৎ কোথায় থাকে পড়িয়া! সেই জন্য যখন শুনি যে আমাদের ধর্ম্মের ঔদার্য্য যেমন এমন আর কোন ধর্ম্মের নয়, আমরা সকল মতেরই বিচিত্র সার্থকতা দেখিতে পাই তখন আমার মনে অনেক সময় সন্দেহ হয় সে ঔদার্য্য ঔদাসীন্যের সমজাতীয় কি না। "যে যে পথ দিয়া যাক্ সে সত্যে পৌঁছিবে" এ কথার ভিতরে একটা ঢিলা ভাব আছে, সচেষ্ট পরীক্ষার যে একটা নিশ্চয়তা তাহা ইহার মধ্যে নাই।

রামমোহন রায় বিশ্বমানবের অখণ্ড স্বরূপের মধ্যে বিশ্বমানবের বিধাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের ভাবলোকের মধ্যে নহে, ধ্যানের মধ্যে নহে, তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেও নহে, সমস্ত মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী সকল চেষ্টা ও সকল চিন্তার মধ্যে তিনি স্তব্ধ-নিবিষ্ট সেই এককে জানিতে চাহিয়াছিলেন

"জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে!"

সেই জন্যই কি তিনি কথা কহিতে কহিতে এক একবার গায়ত্রী মন্ত্রধ্যানের দ্বারা সমস্ত বিশ্বচরাচরের মধ্যে আপনার আত্মার বাধাহীন প্রসরতাকে অনুভব করিয়া লইতেন না?

রামমোহন রায়ের পর হইতে আমাদের দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সকল সাধনা কেবলি বিশ্বানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যাহা বিশ্বের মধ্যে স্থান পাইবার নয়, যাহা কেবল বিশেষভাবে আমাদের সংস্কারের জিনিস, তাহার অন্য যাহাই সার্থকতা থাক্ আমরা তাহাকে গ্রহণ করিতে ভরসা পাইতেছি না। আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছি যে আমাদের সমাজের কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়া আর সত্যের পরিমাপ চলিবে না, এখন বিশ্বমানব আমাদের মানদণ্ড হইবে—সে যাহাকে রাখিবে থাকিবার, তাহাই থাকিবে; সে যাহাকে বলিবে বিনাশ পাইবার, তাহাকে আমাদের মুগ্ধ আসক্তি বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবে।

সময় আসিয়াছে যখন আমাদের উচিত যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের বিশ্বরূপ-দেবতা সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে কেমন করিয়া কাজ করিতেছেন তাহা আমরা সজ্ঞানভাবে অনুসন্ধান করি ও উপলব্ধি করি। কিন্তু রামমোহন রায়ই না বলিয়া গেছেন যে আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেদের মধ্যে নাই, সমস্ত মানুষের মধ্যে আমাদের যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে হইবে?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইউরোপে আধুনিক কালে যে নূতন ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে তাহার পূর্ব্বসূচনা রামমোহন রায় কত পূর্ব্বে করিয়া গেছেন। এমন কি তাহার আদর্শও তাঁহার আদর্শেরই অনুরূপ। গত শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, রাষ্ট্রতন্ত্র সমস্তই অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহই কেবল হইয়াছে, সত্য লাভ হয় নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশিষ্টতার পথে যতদূর যাইবার গিয়া সংখ্যাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—এখন এত বিশিষ্টতা, এত বৈচিত্র্য মিলাইবে কেমন করিয়া, যাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ তাহাদের মধ্যে ঐক্য খুঁজিয়া পাইবে কি উপায়ে তাহাই ইউরোপের ভাবিয়া দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, এ কথা ইউরোপ স্থির জানিতেছে যে মিলাইবার শক্তি আছে কেবল ধর্ম্মের। বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্যের মূর্ত্তি নাই। একমাত্র অধ্যাত্মসত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিশিষ্ট সাধনার চরম পরিণাম, সকল নদী সমুদ্রে যেমন করিয়া মেলে সমস্ত বিশিষ্ট সাধনা ধর্ম্মের অখণ্ড সাধনার মধ্যে তেমনি করিয়া মিলিয়া যায়—কোথাও বিরোধ আর থাকিতে পায় না।

ভারতবর্ষই এ কথা বলিয়াছে, যে অধ্যাত্ম সত্য যে ঐক্যকে রচনা করে সে খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডকে জোড়া দিবার ঐক্য নহে, সে একেবারে রাসায়নিক অখণ্ড ঐক্য। সেই অখণ্ড ঐক্যকেই অধুনা ইউরোপ চায়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ আপনার মানবরূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। অর্জ্জুন তখন সংবৃত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ এবং মানবরূপকে যখন আমরা স্বতন্ত্র করিয়া

দেখি তখন বিশ্বরূপের অগণ্য বৈচিত্র্য চিত্তকে বিভ্রান্ত করে এবং মানবরূপের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য ব্যক্তিগত ভাবের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া যায়। ইউরোপে বিজ্ঞানদর্শন সেই বিশ্বরূপের সাধনায় নিমগ্ন ছিল এবং খৃষ্টধর্ম্ম মানবরূপের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া বিশ্ববিমুখ হইয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ সেই যুগযুগান্তের বিচ্ছেদ মিলিত হইবার উপক্রম করাতে ইউরোপে নূতন আশা বহুযুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের ভিতর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছে। এবার আর আয়োজন নয়, এবার যজ্ঞের হোমহুতাগ্নি জ্বলিবে, এই আশ্বাস নানা লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে।

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি ঐ বাহির পথে!"

আমি জানি, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক লোকের মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে। তাহার প্রধান কারণ আমরা পাদ্রীদের মুখেই খৃষ্টধর্ম্মের কথা শুনি, আমরা তাহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ভিতর হইতে দেখি না। আর একটা কারণ এই যে আমরা জানি কিছুদিন পূর্ব্বেও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ইউরোপে কিরূপ ম্লান ছিল। বিজ্ঞান তো ইহাকে উড়াইয়াই বসিয়াছিল, শিল্প-সাহিত্যও ইহাকে কোন আমল দেয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন এক গির্জ্জায় একদিন একজন উপদেষ্টার মুখে খৃষ্টধর্ম্মের সুতীব্র নিন্দাবাদ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে খৃষ্টের ভিতর দিয়া ভিন্ন ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে না এ কথা যদি বল তবে মানুষ বরং সয়তানকে ভজিবে তথাপি ঈশ্বরকে চাহিবে না। সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মকে যদি রক্ষা করিতে চাও তবে অখৃষ্টান মতামত প্রচার করার প্রয়োজন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে খৃষ্টধর্ম্মের ভিতরে এমন কি আছে যাহাতে একজন পাদ্রীও তাহার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এমন করিয়া প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হন? যাঁহারা সেই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাহারাই যদি সে ধর্ম্মের এমন প্রতিবাদী হন তবে আমরা যে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিব তাহাতে আর বলিবার কথা কি আছে?

খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে আধুনিককালের প্রধান অভিযোগ এই যে সে ধর্ম্মে চারিত্রনীতিকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়াছে যাহাতে মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক্ চাপা পড়িয়া যায়। সৌন্দর্য্যবোধ, কাব্য, কলা, তত্ত্বজ্ঞান এ সব তাহার ভিতরে কোথাও স্ফূর্ত্তি পায় না। অথচ যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে এ সকলেরই স্থান আছে—কারণ আধ্যাত্মিক সাধনা শূন্যতার সাধনা নহে—সে সকল সীমার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া অসীমের অপরূপ আনন্দকে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার সাধনা, সে "সব ঘট পূরণ পূর রহা হৈ" সকল ঘটকে পূর্ণ-করা পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সাধনা, তাহার কাছে জীবনের কোন অংশই বাদ পড়িয়া যায় না। অথচ খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত জীবনকে এমন করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিতরে মিলাইয়া লয় না ইহা সত্য,—সে কেবল বিধিনিষেধের ধর্ম্ম হইয়া মানুষকে কোন্‌টা পাপ ও বর্জ্জনীয় এবং কোন্‌টা পুণ্য ও গ্রহণীয় তাহা জানাইয়া দেয়—সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া অমৃত করিয়া তুলিবার সাধনা তাহার সাধনা নহে।

এ গেল এক অভিযোগ। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সে ধর্ম্ম খৃষ্টকে ঈশ্বর এবং মানবাত্মার মধ্যস্থ করিয়াছে। খৃষ্ট ভগবানের অবতার। তাঁহারই মধ্যে ঈশ্বরের যে প্রকাশ হইয়াছে এমন আর কোন সময়ে অন্য কাহারও মধ্যে হয় নাই, এ কথা সে বলে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এক দিকে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহত্ত্ব ও বিপুলতা, অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য মানবমনের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরলোকের একটি সুগভীর আত্মবোধও মানুষের মধ্যে খুলিয়া গেছে। সুতরাং এ কথা মানুষ বুঝিয়াছে যে ভগবানের প্রকাশ কোন এক সময়ে কোন একজন লোকের মধ্যে হইতেই পারে না—প্রত্যেক মানুষের আত্মার তিনি একলা স্বামী এবং সেখানে কেবল খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়া তিনি যে দেখা দেন তাহা নহে, সেখানে তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ—তাঁহার বিশ্বরূপ ও মানবরূপ একাধারে বিরাজিত। সেখানে "সর্ব্বাণি ভূতানি আত্ম-ন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং"—সকল ভূতের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে সকল ভূতকে দেখা যায়। সেই তো ভগবানের সত্য প্রকাশ। সে কোন গুহ্য প্রকাশ হইতেই পারে না, কোন একটি বিশেষ রূপেরও প্রকাশ হইতে পারে না।

এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য পরে বিচার হইবে কিন্তু এখন যে পাণী বীচ মীন পিয়াসী—জলের মধ্যে থাকিয়াও মীন পিয়াসী, তাহার সে পিপাসা কোন বিশিষ্ট জ্ঞান মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। ইউরোপের ধর্ম্মকে চাই, অত্যন্ত চাই, একান্তই চাই; শুষ্ক পৃথিবী যেমন আকাশের অমৃতময় বারিবর্ষণকে কামনা করে তেমন করিয়া চাই। তাহার কারণ প্রাকৃতিক শক্তির উপরে জয়ী হইয়া উঠিবার সাধনায় তাহার সমস্ত চেষ্টা অহোরাত্র কেবল বাহিরের দিকেই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, অন্তর একেবারে শূন্য, সেখানে নিখিল রসের উৎস খুলিয়া যায় নাই, সেখানে স্তব্ধতার নিবিড় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে না, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং দেখা দিতেছেন না।

কেবল যন্ত্র-তন্ত্র কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মের অসংখ্য জাল সৃষ্টি হইতেছে—চাকা ঘুরিতেছে, সুখ দুঃখ আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মুহূর্ত্ত কাহারও বিশ্রাম নাই, নিবিষ্ট হইয়া আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইবার শক্তিও নাই।

অথচ আন্তরিকতাই ধর্ম্মের প্রাণ। বাহিরের চঞ্চল সৌন্দর্য্য যখন ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, তখন সে আর রূপমাত্র থাকে না সে অপরূপ হয়, তখন বিনাপুষ্পে বন বন পুষ্পিত হইয়া উঠে, সমস্ত শূন্যের মধ্যে অনাহত শব্দে রাগিণী বাজিতে থাকে। বাহিরের কর্ম্ম যখন ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে চায়, তখন সে বাহিরের সফলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, অন্তরের মধ্যে নিরাসক্ত রিক্ততাই তখন তাহাকে আনন্দে ভরিয়া দেয়। ধর্ম্ম কেবলি বাহিরকে ভিতরের দিকে লইয়া আসে—এই তাহার কাজ।

বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চর্চ্চায় ধর্ম্মের এই আন্তরিকতা ইউরোপ হারাইতে বসিয়াছিল। বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলার একটি অংশমাত্র বলিয়া মনে করে, মানুষকে স্বতন্ত্র করিয়া সে দেখেই না। বিজ্ঞান বলে, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত শক্তির দ্বারা মানুষ পরিচালিত, তাহার নিজের একলার কোন বিশিষ্টতা নাই। ধর্ম্মের এ রকমের দৃষ্টিই নয়—বরং ইহার উল্টা। ধর্ম্ম জানে যে সমস্ত বিশ্বজগতের সারসর্ব্বস্ব হচ্ছেন আত্মা—বিশ্ব-অভিব্যক্তির সেই শেষ পইঠা—সেই আত্মার মধ্যেই সমস্ত আসিয়া মিলিয়াছে; সুতরাং মানুষ যখন আত্মবান্ জীব, তখন বিশ্বপ্রকৃতি হইতে সে এক জায়গায় স্বতন্ত্র—কারণ বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণ মঙ্গল ভার ও আদর্শ কেবল মনুষ্যেরই মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। মানুষ শুধু শক্তি দেখে না, নিয়ম দেখে না, সে বিশ্বপ্রকৃতির মঙ্গল অভিপ্রায় দেখে। সে জানে যে এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই জড় হইতে জীবে, জীব হইতে মনুষ্যে ক্রমাগত উদ্ভিন্ন হইতেছে—এই মঙ্গল অভিপ্রায় বিশ্বপ্রকৃতির কণ্ঠের মালা, ইহারি পরিচয় লাভ করিয়া তত্ত্বদর্শিগণ আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে এই কথা নিঃসংশয়ে বলিয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্ম আত্মার আলোকে বিশ্বকে পাঠ করে, বিজ্ঞানের মত অন্তহীন কার্য্যকারণের শৃঙ্খলকে টানিয়া লইয়া চলে না।

ধর্ম্মে তাই অন্তর বাহিরের পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং সে সামঞ্জস্য আত্মায়। সুতরাং ধর্ম্ম না থাকিলে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া জীবনের সমগ্রতা ভাঙিয়া পড়ে। ইউরোপে তাহাই হইয়াছে। সে বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে মানুষকে অগণ্য বস্তুরাশির অন্তর্গত করিয়া দেখিয়া বাহ্যজগতের জড়প্রবাহের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনের সমগ্রতা নানা ভাগ বিভাগে ভাঙিয়া গেলে কেবল বিরোধ দ্বন্দ্ব ও বেদনাই জাগিয়া উঠে, আপনাকে লইয়া আপনার অশান্তির আর নির্ব্বাণ হয় না। তখন স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত বাধে, সৌন্দর্য্যবোধে নীতিবোধে বিবাদ করিতে থাকে, শুষ্ক জ্ঞান কেবল কথা সাজাইয়া ও যুক্তির জাল সৃষ্টি করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার দৈন্যকে ঢাকা দিতে চায়, কেবলি বিরোধ জমিয়া উঠে এবং সে বিরোধ কিছুতেই মিটিতে চায় না। আধুনিক ইউরোপে কি আমরা এই ছবিই দেখিতে পাইতেছি না?

বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানে প্রধানভাবে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের পন্থা ও প্রণালী যদি চ বিভিন্ন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুষ্ক তর্কের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া না দেখিয়া জীবনের ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কতটা কাজে লাগে সেই দিক্ দিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা উভয়দলের মধ্যেই সমান বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে একদল বলেন, আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের বুদ্ধিগম্য নহেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্॥

আত্মাকে বলার দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা বা বহুশাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না—যাঁহাকে ইনি বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আত্মাকে লাভ করার অবস্থা আমরা যে অবস্থায় আছি তাহার উপরের কথা, সাধনার দ্বারা সেখানে আমাদের উঠিতে হয়,—তার মানে—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের পরিপূর্ণ যোগ, এ তত্ত্বকথা মাত্র নয়, এ আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সত্য।

পক্ষান্তরে অন্যদল যাঁহাদের মতবাদের নাম প্র্যাগ্ম্যাটিজ্ম্ তাঁহারা বলেন যে জীবন যখন গতিশীল ও উন্নতিশীল তখন নিত্যসত্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা আমরা জানিতেই পারি না। সে জানা তত্ত্বে জানা হয় মাত্র, জীবনে জানা হইতেই পারে না। জীবনের ভিতর দিয়া জানিতে গেলে সত্যকে টুকরা টুকরা করিয়া জানিতে হইবে। প্রথম দল বলেন ধর্ম্ম মানুষের সকল দ্বন্দ্বের সেতু, সে সকল জানাকে অতিক্রম করিয়া আছে—তাহারি মধ্যে সকল জিনিসের চরম সার্থকতা। দ্বিতীয় দল বলেন ধর্ম্মকে আমাদের অতীত করিয়া রাখিলে সে একটা কল্পনামাত্র হয়, সে যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিস তখন তাহার মতামত সকল কতটা কাজে লাগে তাহাই দেখিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম দল বলেন, সত্য যেখানে আছেন সেখানে আমাদের উঠিতে হইবে; দ্বিতীয় দল বলেন আমরা যেখানে আছি সেখানে সত্যকে নামিতে হইবে। মোটা-

মুট এই দুইটি ধারায় বর্ত্তমান চিন্তার আন্দোলন ইউরোপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

একদল যাঁহারা আপনাদের মতকে নূতন ভাববাদ (New Idealism) নাম দেন্ তাঁহাদের প্রধান নেতা অধ্যাপক অয়্কেন্, একজন জর্ম্মাণ—ইংলণ্ডে অধ্যাপক জোনস্, অধ্যাপক ব্রাড্লি প্রভৃতি এই ভাবের পোষকতা করিয়া থাকেন। অন্যদল যাঁহারা আপনাদের মতকে প্র্যাগ্ম্যাটিজ্‌ম্ নাম দেন তাঁহাদের প্রধান নেতা, আমেরিকার পরলোকগত অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেম্‌স্ ইংলণ্ডে সিলার ডিউয়ি ও ফ্রান্সে ইঁহাদের গুরু হাঁরি বার্গসঁ এ মতের প্রধান আচার্য্য। আমরা ক্রমে ক্রমে এ সকল মতামত লইয়া আলোচনা করিব।

অধ্যাপক অয়কেন্ খৃষ্টধর্ম্মকে তাঁহার নূতন ভাববাদের দিক্ হইতে বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্যটা কি তাহা দেখা যাইবে।

গোড়ায় একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে খৃষ্টধর্ম্ম তাহার আরম্ভকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিচিত্রতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সেই অসংখ্য মতামতের ভিড় হইতে তাহার আসল সত্যটি উদ্ধার করা অতি কঠিন। তাহার অবস্থা ঠিক আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদও আছে আবার ঘেঁটু মনসাপূজাও আছে। সকল ঐতিহাসিক ধর্ম্মেরই ঐ এক দশা, তাহাদের মধ্যে নানাকালের নানা সঞ্চয় আছে।

অয়্কেন্‌প্রমুখ আচার্য্যগণ তাই বলেন যে আমাদের জীবনের ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে পড়িলেই তাহার নিত্যস্বরূপটি কি তাহা স্থির হইতে বিলম্ব হইবে না। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহাই দাঁড় করানো যাক্ তাহা বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা মাত্র। জীবনের ভিতর হইতে দেখিলে অনেক বাদ বিবাদের সামঞ্জস্য মিলিয়া যায় কিন্তু কেবল তর্কের দিক্ দিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সংসাধন অসম্ভব। এখানে এ প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক যে অয়্কেন্ জীবন বলিতে কি বুঝিতেছেন? যদি প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত জীবন হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মমত ভিন্ন হইতে থাকিবে, তখন ধর্ম্ম হইবে প্রত্যেকের আপন আপন মনগড়া ধর্ম্ম।

কিন্তু জীবন অর্থে অয়্কেন্ কেবল মানসিক জীবন বুঝিতেছেন না। আমি বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ সমগ্রতা আছে যেখানে সত্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পান্। সে সত্য আমার তোমার ধারণাগত সত্য নহে, পরন্তু সকল জনের সকল ধারণার অন্তর্নিহিত বাস্তবিক সত্য। সুতরাং সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জীবনই ধর্ম্মের নিত্য সত্য কোথায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কষ্টিপাথর স্বরূপ। আমরা যখন সেই সমগ্রতার বোধে উত্তীর্ণ হই, খণ্ড ধারণা যখন আমাদের মনের মধ্য হইতে ঘুচিয়া যায় তখনই সকল ধর্ম্মের সকল সত্য আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

পণ্ডিত লাইব্‌নিজ্ বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে একটি কথা বলিয়াছেন সে কথাটি জীবনের ভিতর হইতে ধর্ম্মকে দেখিবার এই কথাটির টীকাস্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অতি সরল, কিন্তু নিয়ম যেখানে খাটিতেছে সেখানেই অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশ। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। ধর্ম্মের নিত্য আদর্শগুলি সরল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বহুধা-বিচিত্র।

ধর্ম্ম কি—ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা মিথ্যা। এইটুকু মাত্র বলা চলে যে আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম এ সমস্তের সাধনের দ্বারা আমরা যাহা পাই তাহা খণ্ড পাওয়া, সে শরীরের পাওয়া, মনের পাওয়া, বুদ্ধির পাওয়া—তাহাতে যখন তৃপ্তি মেলেনা, যখন অখণ্ড পাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে, তখনই আমরা ধর্ম্মকে চাই কারণ ধর্ম্মকে পাওয়াই অখণ্ড পাওয়া।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—

যাহাকে পাইলে অপর লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না, ধর্ম্মের পাওয়া সেই পাওয়া।

জগতে যে কয়েকটি বড় ধর্ম্ম আছে তাহারা কেহ বা নীতির দিকে কেহ বা মুক্তির দিকে বেশি ঝোঁক দিয়াছে। কেহ নিয়ম মানিয়া ভৃত্যের মত চলিতে চায়, কেহ নিয়মের উপরে উঠিয়া সত্যের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ বন্ধুর সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। কাহারও কাছে ঈশ্বর কেবল বিধাতা ও শাস্তা কাহারও কাছে তিনি পিতা মাতা ও বন্ধু। নীতিপ্রধান ধর্ম্ম বলে যে জগতে যাহা আছে তাহা বেশ আছে তাহার মধ্যে নীতিবিধানকে যোগ করিয়া দিলেই মানুষের দৈন্য দূর হয়, মুক্তি যাহাদের শেষ লক্ষ্য সে সকল ধর্ম্ম বলে, যাহা আছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম জগতে নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইবার নহে।

সেমেটিক্ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে অর্থাৎ মোহম্মদীয় ও ইহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র খৃষ্টধর্ম্মই মুক্তিকে শেষ লক্ষ্য বলিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মেরও ইহাই শেষ লক্ষ্য। কেবল প্রভেদ এই যে আমরা অদ্বৈত অবধি না পৌঁছান পর্য্যন্ত কোথাও থামিতে চাই না। আমরা মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে, সমাজে, জগতে ও বিশ্বমানবের মধ্যে কল্যাণবুদ্ধিকে ও মৈত্রীকে প্রসারিত করাকেও মুক্তি বলি না—খৃষ্টধর্ম্ম এই পর্য্যন্ত আসিয়াই

থামে—আমরা বলি আত্মা যখন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইয়া আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, আপনার মধ্যে আপনার অন্তরতম আত্মাকে না দেখে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তি নাই। মুক্তি মানে দেহের সংস্কারকে একেবারে ছাড়াইয়া আত্মার লোকে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া—আত্মবান্ হওয়া এবং দ্বিজ হওয়া।

ইউরোপীয়গণ এ জায়গায় হিন্দুদের গালি দিয়া থাকেন। অধ্যাপক অয়্‌কেনও অনেকবার অনেক স্থানে বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মের মুক্তির এই আদর্শে কর্ম্মের প্রেরণা নষ্ট হয়, বৈরাগ্য মানুষকে পাইয়া বসে এবং জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

খৃষ্টধর্ম্মকে ইঁহারা এই বলিয়া শ্রেষ্ঠ আসন দেন যে সে ধর্ম্মেও যদিচ বলে যে "আত্মাকে হারাইয়া যদি সমস্ত জগৎকে মানুষ পায় তাহাতেই বা মানুষের লাভ কি," তথাপি সে ধর্ম্মে বিবেক বৈরাগ্য সাধনের চেয়ে নীতির সাধনার উপর বেশি জোর দিয়া থাকে। পৃথিবীতে মঙ্গলকে পুণ্যকে অমঙ্গল ও পাপের স্থানে সংস্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে হইবে নিয়তই এই দিকে খৃষ্টধর্ম্ম মানুষের চেষ্টাকে ঠেলিয়া দেয়। সেই জন্য এ ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম—বিশেষতঃ আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় দুঃখ হইতে মুক্তি চায় না; সে বলে দুঃখই পূজা, ভগবান স্বয়ং প্রেমে মনুষ্যের দুঃখের কণ্টককিরীট পরিয়াছেন, সেই তাঁহার শ্রেষ্ঠরূপ—সুতরাং সেই দুঃখভার বহন করিয়া মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিতে হইবে।

দুঃখকে বরণ করিয়া দুঃখের উপরে জয়ী হইয়া উঠিবার সাধনা ইউরোপে যদি সত্য না হইত, তবে আমরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতিকে কেতাবী জিনিস বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখি আত্মীয় স্বজন সমাজ সমস্ত পরিহার করিয়া বর্ব্বরদের মধ্যে আফ্রিকার অরণ্যে বা অন্যত্র অসভ্য দেশে খৃষ্টান মিশনারী চিরজীবন উৎসর্গ করিয়া পড়িয়া আছে তখন স্বীকার করিতেই হয় এ দুঃখের সাধনার মূল্য আছে, নিশ্চেষ্টতা ও বৈরাগ্যের চেয়ে ইহার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য অয়কেন বলেন যে ধর্ম্মনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক এ দোঁহার শুভ সম্মিলন খৃষ্টধর্ম্মে যেমন ঘটিয়াছে এমন আর অন্য কোন ধর্ম্মে হয় নাই। এমন বৈপরীত্যের মিলনও অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় নাই। একদিকে আত্মার সঙ্গে সেই পরমপিতার প্রেমে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ যোগ, সেই যোগ পত্নীর সঙ্গে স্বামীর ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার মিলনের মত; তিনি মানুষের ভিতরে আসিয়া মানুষের প্রিয়তম হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিতেছেন—আবার অন্য দিকে মানবসেবা, দুঃখভার গ্রহণের দ্বারা তাঁহার বিধানকে মানুষ মানিয়া লইয়া তাঁহার মঙ্গলসৃষ্টিকার্য্যে ও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সার্থক হইতেছে। তিনি পিতা এবং তিনি বিধাতা—তিনি রাজা এবং তিনি স্বামী—এই বিপরীত সম্বন্ধগুলি খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহার মধ্যে মিলাইয়াছে।

আমার মনে হয় যে এক বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ আর কোন ধর্ম্মেই এমন অন্তরতম এমন নিকটতম নয়। ঈশ্বর মানুষরূপে অন্তরের সমস্ত দুঃখ দৈন্য পাপের মধ্যে তাঁহার প্রেমে নামিয়া আসেন এবং মানুষও সেবার দ্বারা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা কঠিন দুঃখের দ্বারা ক্রমাগতই তাঁহার দিকে উন্নীত হয়, ইহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূল কথা। যদি বল, এ মূল কথা তো প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম অর্থাৎ গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম মানেনা তাহা সত্য। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যে ইহার অভিব্যক্তির সোপানপরম্পরা যে ব্যক্তি অনুধাবন করিয়াছে, তাহার কাছে এ মূল কথাটি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। অবশ্য ইতিহাসের মধ্যেও এ আদর্শের বিকৃতির দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি মেলে—যত অন্যায় যত অত্যাচার ও রক্তসেচন এ ধর্ম্মের নামে হইয়াছে এমন আর কোন ধর্ম্মের নামে হইয়াছে কি না সন্দেহ। তথাপি ইতিহাসকে কেবল ঘটনার দিক হইতে এবং খণ্ডকালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। অন্যায় অত্যাচারের ভিতর দিয়াও যেখানে সত্য ইতিহাসের মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছেন এবং সেই নিত্য সত্যের সূত্রে এক কালের সঙ্গে অন্য কাল অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে ইতিহাসের সেই অন্তরতর চিরন্তনতার দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐতিহাসিক ধর্ম্মমাত্রেই নানা জাতির নানা কালের বিচিত্রভাবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ক্রমেই বিচিত্র বিচিত্রতর হইয়া উঠে। বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে এমন আর কোন ধর্ম্মের মধ্যে নাই। অথচ কেবল বৈচিত্র্য ধর্ম্মকে প্রাণ দেয় না, ধর্ম্মের মধ্যে একটি নিত্য আদর্শ অচলপ্রতিষ্ঠভাবে বিদ্যমান থাকা চাই। রামমোহন রায় ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মের সেই নিত্য আদর্শকে দেখিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্ম্মেরও মূল আদর্শ টি কি তাহা ইউরোপীয় ভাবুকগণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করিতেছেন।

ইহুদিধর্ম্ম হইতে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া উক্ত ধর্ম্মের পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বমূলক ধর্ম্মনীতি ইহার মধ্যে পাপপুণ্যের সংঘাতের ভাবটিকে খুব তীব্র করিয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে। তার পর গ্রীক্ ভাবের সঙ্গে ইহার মিলন যখন ঘটিল তখন গ্রীকদের বৈচিত্র্যের পিপাসা এবং তাহাকে সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিল এবং ইহার একান্ত অন্তর্মুখীন ভাবকে আঘাত করিল। আপনারা সকলেই জানেন যে

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে প্রাচীন গ্রীসীয় জ্ঞানের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রায় ভাসিয়া যাইবার পথে আসিয়াছিল। তাহার কারণ সেমেটিক অর্থাৎ ইহুদীয় ভাবের সঙ্গে গ্রীক ভাবের সকল বিষয়েই উল্টা। ইহুদীর ঈশ্বর পৃথিবী হইতে দূরে—এবং গ্রীক দেবতাগণ একেবারে পৃথিবীর ভিতরে—তাঁহারা প্রত্যক্ষ মানবরূপী দেবতা। ইহুদীদের মধ্যে পাপপুণ্যের বোধ অত্যন্ত তীব্র গ্রীকদের মধ্যে সেরূপ সংঘাতের ভাব প্রায় নাই বলিলেও চলে।

ইহার পরে ক্রমে ইন্দোজর্ম্মাণজাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম যখন আসিয়া পড়িল তখন এই ইহুদী গ্রীকের সংঘাতোত্থ দূর এবং নিকট, সসীম এবং অসীম এই দ্বৈতভাবকে ভক্তির সূত্রে বাঁধিয়া তাহারা এক অপূর্ব্ব গুহ্যতত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে ঐতিহাসিক দিক দিয়া আলোচনা করিলে এটা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে প্রত্যেক যুগে নানা জাতির নানা ভাবের ভিতর দিয়া খৃষ্টধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শটি ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একান্ত অন্তর্মুখীন ভাব কাটিয়া গিয়া সে বিশ্বব্যাপক হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। কোন ধর্ম্মই এমনতর নয় যে সে কোন এককালে হইয়া বইয়া চুকিয়া আছে, কালে কালে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবেনা। যদি এমনই হয় তবে সে তো মৃতধর্ম্ম, তাহাকে লইয়া মনুষ্যের কোন লাভ নাই। ধর্ম্ম কোন মহাপুরুষের একলার জিনিস নয়, কোন গ্রন্থের বা শাস্ত্রের জিনিসও নয়—সকল কালের মানুষের আত্মাই তাহার প্রকাশক, তাহার শাস্ত্র। তাহার মধ্যে একটি অক্ষয় অমর নিত্য সত্য আছে বলিয়াই তাহার কোন কালে শেষ নাই, যুগে যুগে সে কেবলি নূতন নূতন হইয়া চলিয়াছে এবং যুগের সঙ্গে যুগও সেই সত্যের অক্ষয় বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যাইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের সেই মূল নিত্য কথাটা কি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা গেল। আমি বলিয়াছি যে রামমোহন রায় ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা হইবার বহুপূর্ব্বে এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখনও খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যগণের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মকে অন্য সকল ধর্ম্ম হইতে প্রাধান্য দিবার জন্য অত্যন্ত বেশি ব্যগ্র। সকল দেশে সকল সভ্যতায় সকল ধর্ম্মেই ব্রহ্মের প্রকাশ, তিনি সকল বৈচিত্র্যের ভিতরে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট—সমস্ত বৈচিত্র্যের তলায় তাঁহার সেই এক রূপকে সাধনার দ্বারা দেখিবার আদর্শ ছিল রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং ইহাই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আদর্শ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কোন একটি ধর্ম্মের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত প্রকাশ এরূপ মনে করা মানেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী সে কথা অস্বীকার করা।

অধ্যাপক অয়কেন্ সম্বন্ধে আলোচনা কালে যে দুই একটি কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকদের মনে হইতে পারে যে তিনিও এই একদেশদর্শিতার দোষে আক্রান্ত। কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার মত উদারচেতা এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ইউরোপে এখন দ্বিতীয় কেহ নাই। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি জানেন অতি অল্প তথাপি অনুবাদে যেটুকু যাহা পড়িয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অন্তরের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা খুবই জাগ্রত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার একটি পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

"ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত না হইলে এবং তাহার অনেক সার সত্য আপনার মধ্যে গ্রহণ না করিলে খৃষ্টধর্ম্ম যে কোন দিনই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারিবে না আপনার এ মত আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। আমি বিশ্বাস করি যে বিশিষ্ট ধর্ম্মের যুগ এখন চলিয়া গেছে—নিজেদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙিয়া এখন আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্মকে বিশ্বমানবের ধর্ম্মে উপনীত করিতে হইবে। এই কার্য্যে ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম পরস্পরের সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষে যেমন স্পষ্টতঃ ঐক্যের বাণী এবং অনন্তের বাণী, সকল জড়বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্তি এবং চিন্তার সুগভীর স্তব্ধতার কথা বলা হইয়াছে এমন আর কোথাও হয় নাই। পক্ষান্তরে দ্বন্দ্বমূলক ধর্ম্মনীতি, বিবিধ মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের রচনা ও কর্ম্মের প্রেরণা এই সকল জিনিসের উপরই খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ শক্তিও নির্ভর করিতেছে। এই দুই ধর্ম্মই পরস্পরের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে। আর আমি আশা করি যে এই সকল জীবনের জটিল সমস্যা ক্রমশই মানবসমাজের সম্মুখবর্ত্তী হইবে।"

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

গীতাপাঠ।

(আবহমান)

এই যে একটি কথা—যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অথচ আত্মা যিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা তিনি নির্গুণ, এ কথাটি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই—বিশেষত সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে—আবহমান কাল হইতে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ও-কথাটির অর্থ কি? ত্রিগুণ পদার্থটা কি? এই প্রশ্নের যথাবৎ মীমাংসা করিতে হইলে সত্ত্বগুণের গোড়ায়

কাহিনীটি অন্ধকার হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটির নিষ্পাদন অতি সহজে হইতে পারে—হয় না কেবল আমাদের নিজের দোষে। আমরা গোড়ার পঁইটা হইতে যাত্রারম্ভ না করিয়া আগে-ভাগেই চরম পঁইটাতে পদনিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, আর সেই জন্য অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। অতএব আমাদের এই চাপল্য-দোষটিকে প্রশ্রয় না দিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্ত্বগুণের গোড়ার কাহিনীটির তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ইহা সকলেরই জানা কথা। এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎ শব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সত্তা এবং সত্ত্বের মধ্যে অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে-কোনো বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ, সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হচ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটি সদ্বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে।

আমরা প্রতিজনে আমাদের আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তা'র সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্মসত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা কোনো কালেই আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তা'র সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে আমরা এটা বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ কথাটি বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ; এমন কি—সত্ত্বগুণের সহিত প্রকাশ এবং আনন্দের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ইঙ্গিতচ্ছলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই যে, প্রকাশ এবং আনন্দের নামই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখিলাম, এখন রজোগুণ এবং তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

নানা কবির কবিতা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টিকবিতা। পক্ষান্তরে কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা এই অর্থে সমষ্টি-কবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ তিনি কে? তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—তিনি প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতায় যেমন শেক্সপিয়রীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, শেক্সপিয়রের কবিতাতেও তেমনি কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; তেমনি আবার মিণ্টনের কবিতাতেও ও-দুই শ্রেণীর কবিত্বগুণের কোনোটিরই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবেই হইতেছে যে প্রকৃতিদেবীর হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত সমষ্টিকবিতা যেমন পূর্ণমাত্রা কবিত্বের অভিব্যঞ্জক, ব্যষ্টিকবিতা সেরূপ নহে; ব্যষ্টিকবিতা মাত্রই কবিত্বগুণের দেশ-কাল-পাত্রোচিত খণ্ডাংশেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতা সম্বন্ধে এ যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তা-সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন আরেক শাখার পুষ্প নহে, তেমনি তোমার সত্তাও আমার সত্তা নহে, আমার সত্তাও তোমার সত্তা নহে, এবং তৃতীয় আর যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তাও তোমার বা আমার সত্তা নহে। ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেই জন্য কোনো ব্যষ্টিসত্তাই পূর্ণমাত্রা সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক নহে; ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, সুতরাং বৃক্ষের পুষ্পই সমষ্টি-পুষ্প, আর সকল শাখার পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত; তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টিসত্তা এবং আর

আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টিসত্তার অন্তর্ভূত; আর, সেই জন্য সমষ্টিসত্তা যেমন অবাধিত সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের নিধান, ব্যষ্টিসত্তা সেরূপ নহে। ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের, অথবা যাহা একই কথা—বাধাক্রান্ত প্রকাশ এবং আনন্দের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর একটি হ'চ্চে আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য বা জড়তা এবং অবসাদ বা স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ বা পীড়ানুভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের আর এক নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কি অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কি অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড় কাচা তো ছিলই, তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র রঙানো; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা রজক নামে প্রসিদ্ধ—বস্ত্র রঞ্জন করে অর্থাৎ রঙায় এই অর্থে রজক। রঙ সম্বন্ধে জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—একদিকে সাদা, আর একদিকে কালো এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, কালো রঙ রঙই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর এক নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক উল্টা পিঠ সুতরাং তাহাও প্রকৃত পক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণরাজির লয় স্থান—তাহা শুভ্র আলোক। বর্ণক্ষেত্রও যেমন তিন ভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এ মুড়ায় রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক; ও-মুড়ায় রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রঞ্জন। অর্থাৎ একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের চেতনজ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তা অন্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রাগ-দ্বেষরূপী রজোগুণের রঞ্জন। তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ এইজন্য তাহা অন্ধকার ঘ্যাঁসা নীল রঙের সহিত উপমেয়; দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। অনুরাগ সত্ত্বগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ, এই জন্য তাহা আলোক ঘ্যাঁসা পীত রঙের সহিত উপমেয় —গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাই পীতাম্বর হইয়াছেন; পরন্তু রজোগুণের নিজমূর্ত্তি হ'চ্চে রাগ; তার সাক্ষী রজোগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ—কাম এবং ক্রোধ—দুইই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগ বটেই; তা ছাড়া বঙ্গ-ভাষায় ক্রোধের আর এক নাম রাগ। রাগই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের গোড়ার সূত্র। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি এই যে, রাগ, ইহা লাল রঙের সহিত উপমেয়। রক্ত শব্দ, রঞ্জন শব্দ, রজঃ শব্দ, রাগ শব্দ, সবাই এরা একই মূলধাতুর সন্তান সন্ততি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। লাল রঙ দেখিলেই বৃষজাতি ক্ষেপিয়া ওঠে—রক্ত গরম হইলেই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য হয়—দুঃখজ্বরে রক্তের তাপ বৃদ্ধি হয়—এ সমস্তই রজোগুণের লক্ষণ। এই জন্য যদি উপমাচ্ছলে বলা যায় যে, সত্ত্বগুণ সাদা, তমোগুণ কালো, রজোগুণ লাল, তবে প্রকৃত কথাটা যে কি বলা হইল তাহা সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সহসা বোধগম্য না হইতে পারুক্, পরন্তু ভাবুক লোকের তাহা বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এ সকল ফ্যাঁক্ড়া কথা ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবের বাঁধা রাস্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

একটু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় যে কে তাহাও আমরা দেখিয়াছি; আমরা দেখিয়াছি যে, যে-দুইটি মূল উপাদান সত্ত্বগুণের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে—কিনা প্রকাশ এবং আনন্দ—তাহাদের প্রথমটির (অর্থাৎ প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে তমোগুণ বা জড়তা এবং অবসাদ; দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। তা'ছাড়া, রজোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। বাধার অনুভব হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেরই জানা কথা; এমন কি—বাধানুভবেরই নাম দুঃখ। বাধানুভব যদিচ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ন্যায় সুস্পষ্ট চেতন নহে, কিন্তু তথাপি তাহা যে চেতনের পূর্ব্বাভাস তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; পরন্তু তমোগুণের জড়তার মধ্যে চেতনের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমনি আবার, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের মধ্যে যদিচ কেবল আনন্দ হাত বাড়াইয়া পাইবার জন্য এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন আঁকুবাঁকুর ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়, তা ভিন্ন কর্ত্তৃত্বমূলক কর্ম্মচেষ্টার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাহা যে স্বাধীন কর্ম্মোদ্যমের পূর্ব্বাভাস তাহাতে আর ভুল নাই; পক্ষান্তরে, তমোগুণের জড়তা এবং অবসাদের মধ্যে কর্ম্মোদ্যমের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে শুধুই যে কেবল সত্ত্বগুণের সহিত অপর দুই গুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা নহে; পরন্তু সে প্রদেশে তিন গুণই পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, তিন গুণের কোনো-না-কোনোটির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোনো-না-কোনোটির প্রসুপ্ত ভাব, কোনো না-কোনটির অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক জুড়িয়া সর্ব্বত্রই পরিকীর্ণ রহিয়াছে; সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিও এমন কোনো বস্তু খুঁজিয়া পাইতে পারিবার জো নাই, যাহাতে তিন গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে একত্র যোটবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি না করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ত্রিগুণের একটি-না-একটির সাময়িক প্রাদুর্ভাব এবং সেই সঙ্গে অপর দুইটি গুণের কোনোটির বা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব এবং কোনোটির বা প্রসুপ্ত ভাব যাহা আমরা প্রতি জনে আপনার আপনার মধ্যে কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, তাহাই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত আকাশক্ষেত্রে পরিবেশিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রাতঃকালে সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিপূর্ব্বে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশত আমাদের ভিতরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ নাই, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুর মধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ, আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ পায় না। ইহা দৃষ্টে কেহ যদি মনে করেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান ছিল না—প্রসুপ্ত ভাবেও বিদ্যমান ছিল না, অথবা যদি মনে করেন যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুতে প্রকাশ এবং আনন্দ তথৈব দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান নাই—বীজ-ভাবেও বিদ্যমান নাই, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। এ তো সোজা কথা যে, আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় যদি আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অর্থাৎ ধামাচাপা ভাবে বিদ্যমান না থাকিবে, তবে আমাদের জাগরণ মুহূর্ত্তে ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপার-গুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া জুটিবে কোথা হইতে? তেমনি আবার জড় পরমাণু-নিচয়ের মধ্যে যদি ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি ধামাচাপা না থাকিবে, তবে এককালে তো আমরা মাতৃগর্ভের জরায়ুশয্যায় প্রকৃত-পক্ষেই জড়পিণ্ড ছিলাম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ চেতন-ব্যাপারগুলির অস্ফুট আভাস আমাদের এই জড়শরীরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, গোড়ায় সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ না থাকিলে, সেই আনন্দের বাধানুভূতি যাহার আরেক নাম দুঃখ তাহা থাকিতে পারে না; আনন্দের বাধানুভূতি না থাকিলে আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু অর্থাৎ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না; আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু না থাকিলে আনন্দের বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা থাকিতে পারে না; বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিলে, ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জড়পরমাণুচয়ের সঙ্গে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি-ক্রিয়া নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে এটা সকলেরই জানা কথা; কাজেই, এই মাত্র যে-একটি সম্ভাবনীয়তার সোপান-পদ্ধতি দেখাইলাম তাহা হইতে আসিতেছে এই যে, সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিয়ার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা রহিয়াছে; সেই বাধা অতিক্রমণের চেষ্টার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার জন্য একটা আঁকুবাঁকু রহিয়াছে; আনন্দের জন্য এই যে একটা আঁকুবাঁকু তাহার মূলে আনন্দের বাধানুভূতি রহিয়াছে; আনন্দের বাধানুভূতির মূলে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ রহিয়াছে এবং সেই আনন্দের মূলে সত্তার প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীবের মধ্যেও যেমন, জড় পরমাণুর মধ্যেও তেমনি, উভয়ত্রই তিন গুণই এক সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রকাশ এবং আনন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়তা এবং অবসাদও বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, জড়জগতে তমোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; নীচের ধাপের জীবজগতে রজোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; উপরের ধাপের জীবজগতে অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজে সত্ত্বগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। এখানে, একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, জড়বস্তুর মধ্যেও কি, সত্ত্বগুণ আছে—প্রকাশ এবং আনন্দ আছে? ইহার উত্তর এই যে, আছে—কিন্তু প্রসুপ্ত ভাবে। ফলে জড়বস্তুর ভিতরে সত্ত্বগুণের বর্ত্তমানতা যতই তর্কের বিষয় হউক্ না কেন—সে সম্বন্ধে অন্ততঃ এটা স্থির যে, জড়বস্তুর সত্তা শুধু কেবল তোমার বা আমার বা অপর কাহারো মনোগত সত্তা নহে—পরন্তু তোমার সত্তা যেমন বাস্তবিক সত্তা, জড়বস্তুর সত্তাও সেইরূপ বাস্তবিক সত্তা। আমি যদি বলি যে তোমার সত্তা তোমার নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, তথৈব জড়বস্তুর সত্তা জড়বস্তুর নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, দুইই কেবল আমার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় এই যে, প্রভূত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমার সত্তাই বাস্তবিক সত্তা, তা বই তোমার সত্তা বা আর কোনো কিছুর সত্তা আমার

একটা মনগড়া সামগ্রী বই আর কিছুই নহে। এই জন্য আমি তাহা না বলিয়া বলি শুধু এই যে, তোমার নিদ্রাবস্থাতে যেমন তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ তোমার সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তোমার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ জড়পরমাণুর সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তাহার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে—এই যা কেবল; তা বই, জড়বস্তুর মধ্যে ঐ দুইটি সত্ত্বগুণের ব্যাপার মূলেই যে বিদ্যমান নাই তাহা নহে।

মানবসমাজের প্রতিভাশালী আদি গুরুগণের চক্ষুই স্বতন্ত্র। তাহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি একপ্রকার অন্তর্দীপনী আলোকছটা—একপ্রকার X-ray। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবসায়ীরা যাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পান না—সেই সকল বিশ্বব্যাপী মহাতত্ত্ব অতীব স্বল্প উপলক্ষে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। তা'র সাক্ষী:—নিউটন একটা বৃন্তচ্যুত আপেল ফলকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া তাহার আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ভারাকর্ষণের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। গ্যালিলিও তাঁহার দেশের ভজন-মন্দিরের মূর্দ্ধালম্বিত দীপঝাড়ের দোলনের ভাবগতি দেখিয়া তাহার আলোকে এই একটি বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দোলা-মাত্রেরই পর্য্যাবর্ত্তন সামকালিক। আমাদের দেশের আদিম আচার্য্যেরা তেমনি জীবপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা দেখিয়া তাহার আলোকে সর্ব্বময়ী মহাপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শেষের বার্ত্তাটির আমি সন্ধান পাইলাম কিরূপে তাহা বলিতেছি—প্রণিধান কর। সত্ত্ব শব্দের প্রচলিত অর্থ জীব। তার সাক্ষী:—দেশীয় সাধুভাষায় গর্ভিণী নারীকে বলা হইয়া থাকে অন্তঃসত্ত্বা—অন্তরে সত্ত্ব কি না জীব জাগিতেছে এই অর্থে অন্তঃসত্ত্বা। তা' ছাড়া কাব্য পুরাণাদিতে সমুদ্র-বর্ণনার প্রসঙ্গস্থলে ভূয়োভূয় এইরূপ স্বভাবোক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্র তিমি মকর প্রভৃতি মহাসত্ত্বগণের বাসস্থান। অতএব প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সত্ত্ব শব্দের অর্থ যে জীব তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন কথা হচ্চে এই যে, মনুষ্যই জীবের মধ্যে সেরা জীব বা আদর্শ জীব, আর, মনুষ্যের একটি প্রধান জাতি-পরিচায়ক-লক্ষণ হ'চ্চে বুদ্ধিমত্তা। এইজন্য দার্শনিক ভাষায় জীবের পরিবর্ত্তে মনুষ্যজাতি-সুলভ স্থির বুদ্ধিই বিশেষার্থে সত্ত্ব নামে সংজ্ঞিত হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের তৃতীয় পাদের সর্ব্বশেষের সূত্রটির প্রতি যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর তবে দেখিবে যে, সে সূত্রটি এই:—"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং।" ঐ দর্শনের ভাস্বতী টীকায় "সত্ত্বশুদ্ধি" এই বচনটির অর্থ ভাঙিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ:—"সত্ত্বস্য—বুদ্ধিদ্রব্যস্য শুদ্ধিঃ" সত্ত্বের শুদ্ধি কি না বুদ্ধি-পদার্থের শুদ্ধি। এখন দেখিতে হইবে এই যে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা স্থির বুদ্ধিই বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নিলয়; জীবের অস্থির মনই দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের নিলয়; জীবের স্থূল শরীরই জড়তা এবং অবসাদের নিলয়। এই জন্য বলিতেছি যে, খুব সম্ভব আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জীবের মধ্যে ঐ তিনটি আদর্শভূত সত্ত্বরজস্তমোগুণের ব্যাপার পরস্পরাশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই আলোকে এই মহাতত্ত্বটি প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণের লীলাক্ষেত্র, এমন কি সত্ত্বরজস্তমোগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব। তাঁহারা আরো বলেন এই যে, জগতের মধ্যস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ একত্র যোটবদ্ধ রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, তিন গুণের যে গুণটি এক বস্তুতে প্রকট ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, সেই গুণটি আর এক বস্তুতে অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এবং তৃতীয় আর এক বস্তুতে তাহা প্রসুপ্ত ভাবে বা বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই সহজে পাইতে পারি। আমাদের নিদ্রাবস্থায় যখন আমাদের মনোমধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমরা জড়পদার্থের—বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ পদার্থের—দলভুক্ত হই। তমোগুণের এইরূপ প্রাদুর্ভাবকালেও আমাদের মধ্যে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য ন্যূনাধিক পরিমাণে তলে তলে চলিতে থাকে, তা বই ও-দুয়ের কোনোটির কার্য্য একেবারেই বন্ধ থাকে না। তাহার সাক্ষী:—নিদ্রান্ধকারের মেঘের আড়ালে ঘড়ি ঘড়ি স্বপ্নের ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতে থাকে ইহা সকলেরই জানা কথা; এরূপ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য যে রজোগুণের ব্যাপার তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তা ছাড়া, নিদ্রান্ধকারের আরো গভীর অন্তস্তরে সত্তার প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের সঙ্গাশ্রিত সুনির্ম্মল আনন্দ এই দুই সত্ত্বগুণের ব্যাপারও যে তলে তলে জাগিতে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, কেহ যদি কাহারো সুনিদ্রা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গাইয়া দ্যায়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নাবিল এই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখের বড্ড একটা অভাব অনুভব করে। আমাদের এই স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিদ্রা স্বপ্ন এবং জাগরণ দৈনন্দিন ব্যাপার, পরন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঐ তিনটি অবস্থা-পরিণাম যুগযুগান্তরের ব্যাপার। তাহা হইবারই কথা—কেন না ব্রহ্মার

এক দিন আমাদের এক যুগ। তমোগুণের প্রাদুর্ভাব-কালে অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমরা যেমন কার্য্যত অচেতন হই অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে practically unconscious সেই ভাবে অচেতন হই; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের জড়পরমাণু সকল সেই ভাবেই অচেতন; তা বই, এ ভাবে অচেতন নহে যে, তাহাদের মধ্যে চেতন মূলেই বর্ত্তমান নাই—বীজ ভাবেও বর্ত্তমান নাই। আবার রজোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে যখন আমাদের মনোমধ্যে স্বপ্নের আধিপত্য হয়—তা' সে নিদ্রাবস্থার খাঁটি স্বপ্নই হো'ক্ আর জাগরিতাবস্থার জাগ্রৎস্বপ্নই হো'ক্ তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না, আর সেই স্বপ্নের ঝাপ্‌সা আলোকে আমরা যেমন প্রবৃত্তির ঝোঁকে ইতস্তত নীয়মান হইয়া কার্য্যত মূঢ়জীব বনিয়া যাই, পশ্বাদি জন্তুরা সেই ভাবে মূঢ়জীব। অধুনাতন কালের নব্যতম প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পিপীলিকা মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন জীবদিগের স্বভাব চরিত্র এবং কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Somnambulist সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা) যেমন ঘুমের ঘোরে কেহ বা কলেরিজের কুব্‌লাখানের ন্যায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে, কেহ বা গণিতের দুরূহ সমস্যা অবলীলাক্রমে পূরণ করে, কেহ বা সংকটময় দুর্গম পথ অবলীলাক্রমে অতিবাহন করে, মৌমাছি পিপীলিকা প্রভৃতি অমেরুক (avertibrated) শ্রেণীর জীবেরা সেই গোচের এক প্রকার অস্ফুট চেতনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোকে প্রবৃত্তির ঝোঁকে নীয়মান হইয়া আপনাদের গার্হস্থ্য সামাজিক এবং আর আর শ্রেণীর নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল যথাবৎ অভ্রান্ত অপ্রমত্ত এবং অবিচলিত ভাবে নিষ্পাদন করে। ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল যেন অচেতন বস্তু—পশ্বাদি জন্তুরা যেন মূঢ় জীব—আমরা কি? "আমরা কি?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা নহি কি? অর্থাৎ আমরা সবই। আমাদের নিদ্রাবস্থায় আমরা উদ্ভিদ্‌পদার্থ, স্বপ্নাবস্থায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান মূঢ়জীব, জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্য। তবেই হইতেছে যে, আমরা প্রতিজনে এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আবার বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ছাঁচে গঠিত। বৃহদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মতালের বা সুদীর্ঘচ্ছন্দের গাথা; ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সবই লঘুত্রিপদীচ্ছন্দের পদ্য। আমাদের নিদ্রার কাল এক রাত্রির অধিক নহে, পরন্তু পৃথিবীতে যতকাল পর্য্যন্ত জীবের উন্মেষ হয় নাই ততকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল; তাহার পরে পৃথিবীর নিশা-গ্রস্ত অবস্থায় কীট পতঙ্গাদির নড়ন-চড়ন এবং চলাফেরা আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর স্বপ্নাবস্থায় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্যের আবির্ভাব হইল। আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় যেমন তাহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দ বিরাজ করে, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার নীচের স্তরে মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের জাগ্রৎস্বপ্ন এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত দুঃখ ও প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; আর, সময়ে সময়ে যখন সেই রজোগুণের ব্যাপারটা প্রবল হইয়া ওঠে তখন তাহা দর্শকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার যদি একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন বা নমুনা দেখিতে চাও তবে Elba উপদ্বীপে অবস্থিতি-কালে প্রথম নেপোলিয়নের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার কোনো প্রকার শারীরিক কষ্ট বা আর্থিক কষ্ট ছিল না অথচ রজোগুণের প্রাদুর্ভাববশত তাঁহার মন নানা প্রকার জাগ্রৎস্বপ্নে, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে এবং দুঃখ যন্ত্রণায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্ করিত, অথচ তাঁহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দের ন্যূনতা ছিল না। তেমনি আবার মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের নীচের স্তরে স্থূল শরীরাশ্রিত প্রসুপ্ত চেতনের বা প্রাণের ব্যাপার—অর্থাৎ যেমন অন্ন হইতে রক্তের উৎপাদন—রক্ত হইতে অস্থি-মজ্জা মাংস-পেশী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চালান্ —এই সকল প্রাণের ব্যাপার তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন নাড়ীপথের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিতে থাকে এরূপ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানালোকের প্রবেশের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এতগুলা কথা যাহা আমি সবিস্তরে ভাঙিয়া বলিলাম তাহা যদি সংক্ষেপে এইরূপে সাঁটেসোঁটে বলা যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের উপরি স্তরে ভিতরের মনুষ্য বিরাজমান হয়, তাহার এক ধাপ নীচের স্তরে ভিতরের সিংহ ব্যাঘ্র ছাগ-মেষাদি বিচরণ করে, এবং তাহার আরো নীচের স্তরে ভিতরের ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুসকল জমাট্‌বদ্ধ হয়, তবে খুব সম্ভব যে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্রোতৃবর্গের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় এ যেমন দেখা গেল, পৃথিবীর জাগরিতাবস্থাতেও তেমনি উপরের ধাপে সত্ত্বগুণপ্রধান মনুষ্যমণ্ডলীর ব্যাপার সকল চলিতেছে, বুদ্ধির অঙ্গীভূত জাগ্রত চেতনের নীচের ধাপে রজোগুণপ্রধান অপরাপর জন্তুদিগের স্বপ্নবৎ অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে, এবং তাহারও নীচের ধাপে তমোগুণপ্রধান উদ্ভিদ্ এবং ধাতু প্রস্তরাদি জড়বস্তু সকলের বীজভাবাপন্ন অস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সারা বিশ্বব্রহ্মা-

ণ্ডের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত্রিগুণের লীলাক্ষেত্র,—ত্রিগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা আমি বলিলাম এ সকল কথা ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টি-সত্তার সম্বন্ধে খাটে না। সমষ্টি-সৎ এবং ব্যষ্টি-সৎকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, তুমি এবং আমি দুই, এই জন্য তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে, আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম কর তবে তাহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসৎ মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে; আর সেই সূত্রে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ এবং তমোগুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;—সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কাজেই ব্যষ্টিসত্তা ত্রিগুণাত্মক। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, তোমার বাহিরে যেমন আমি রহিয়াছি, এবং আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ, সমষ্টিসতের বাহিরে সেরূপ দ্বিতীয় কোনো কিছুই নাই; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসতের সত্তার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসতে সাত্ত্বিক-প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতন-জ্যোতি এবং সাত্ত্বিক আনন্দ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই জন্য আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে সমষ্টিসৎ চিদানন্দ স্বরূপ। আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় রহস্য আজ যাহা আমি সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সহিত ডারুইনের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য আগামীবারে তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইবে; এবং তাহার পরে গীতাশাস্ত্রোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধান।

কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ,—
খুঁজে হয় সারা নাহি পায় সন্ধান।
উষার উদয়ে নিশার তিমির তলে,
সুখের পুলকে দুখের নয়নজলে,
বনমর্ম্মরে নির্ঝর-কলকলে
ধ্বনিত বিপুল তান।
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরাণ মোর
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।

কার লাগি এই বিশ্বসভার দ্বারে
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে!
কত খেলা হল কত না পথের শেষে,
কত কাল ধরে ভ্রমিল কতনা দেশে,
কথনো সেজেছে দীন দরিদ্র বেশে,
কথনো রতন হারে।
আলোকে আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে শুধু
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে।

আপনারে খুঁজে কে আপনি দিশাহারা!
দূরে চলে যায় চোখে বহে জলধারা।
জানেনা জানেনা নিখিল ভুবনমাঝে
তারি আপনার পরম আপন রাজে,
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে
বিপুল গানের ধারা।
সকল দৃশ্যে সব সঙ্গীতে তালে
আপনারে খুঁজে কে হলরে আজ সারা!

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র। *

জীবাত্মার মুক্তিতে কি যায় এবং কি থাকে—একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকে কি না এই প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্ব্বতন কোনো কোনো লেখায় আমি আলোচনা করেছি। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আর একবার সে কথাটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি।

জগতে যা কিছু দেখ্‌চি শুন্‌চি সমস্তই চঞ্চল—কিন্তু এই চঞ্চলতাই একটি ধ্রুবকে প্রকাশ করচে। কেননা, সূত্রকে আশ্রয় না করলে যেমন কোনোমতেই মালা গাঁথা চলে না—তেমনি ধ্রুবকে আশ্রয় না করলে চঞ্চলতা টি'কতেই পারে না। সমুদ্র স্থির আছে বলেই ঢেউয়ের চঞ্চল লীলা তাকে অবলম্বন করে কলগানে নৃত্য করচে। সমস্তই চলেচে, এবং চল্‌তে চল্‌তে বলচে, এক আছেন—সেই চলাও শেষ হচ্চেনা এবং এই বলাও শেষ হচ্চেনা। সংখ্যাহীন গণনার দ্বারা অন্তহীন এক আপনাকে প্রকাশ করচেন। এই যে নানা, এ যেন অনন্তের মাপ-কাঠির মত, কেবলি চলচে আর বল্‌চে, শেষ হলনা শেষ

* কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পত্রের উত্তরে।

হলনা—নানার পর নানা, তার পরেও নানা—অন্ত নেই। সচল মাপকাঠি ছাড়া অচল অনন্তকে অনন্ত বলে প্রচার করবে কে?

কিন্তু সান্তের ভিতর দিয়ে অনন্ত এই যে আপনাকে প্রকাশ করচেন তার দরকার কি? দরকার কিছুই নেই, অর্থাৎ বাইরের কোনো তাগিদ নেই—তাঁর আনন্দের পূর্ণতাই আপনাকে আপনি প্রকাশ করচে। প্রকাশই তাঁর স্বভাব। এইজন্য বেদে তাঁকে বলেছে "আবিঃ" অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ।

যিনি প্রকাশ স্বরূপ, প্রকাশ যদি তাঁর না হয় তাহলেই তাঁর বাধা; প্রকাশেই তাঁর মুক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের মধ্যেই ব্রহ্মের আনন্দ উন্মুক্ত। এই জগৎকে বন্ধনরূপ বলতে পারিনে কেননা এই ত তাঁর আনন্দরূপ। জগতে তিনি আপনাকে সর্জ্জন করচেন। বদ্ধ করচেন না। বস্তুত জগতে ত কিছুই বাঁধা পড়তে চায় না।

কিন্তু আর একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে মুক্তি দিতে গেলেই বন্ধনকেও মানতেই হয়—যদিচ সে আনন্দের বন্ধন। যে আনন্দে কবি কাব্য লেখে সেটাকে যদি অন্তরে রুদ্ধ করে না রাখা হয়, যদি তার স্বাভাবিক প্রকাশচেষ্টাকে মুক্তি দিতে হয় তাহলে স্বেচ্ছায় ছন্দোবন্ধকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

এইজন্যে যদিচ অনন্তের আনন্দ হতেই সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—তবুও স তপোঽতপ্যত। এই আনন্দকে প্রকাশ করার যে তপ তা স্বীকার করতেই হয়েছে—বাধার বন্ধনরূপ ছন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া বিশ্বকবির আনন্দ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই বাধা বাইরের বাধা নয়—এ বাধা লীলার—সেইজন্যে, আমরা বিপরীত দিক থেকে দেখ্‌তে গিয়ে এ'কে দুঃখরূপে যদিবা দেখি, কবির কাছে এ আনন্দের।

ভাবটাকে বাদ দিয়ে রূপটাকেই আমি যদি একমাত্র করে দেখি তাহলে ভিতরকার আনন্দকে জান্‌তেই পারিনে—কেবল তপটাকেই দেখি, দুঃখটাকেই পাই। এই বাইরের দিকটাই চঞ্চল দিক, এর কেবলি পরিবর্ত্তন। এইটেকেই যখন একমাত্র জানি তখন এই চঞ্চলটাকে স্থির করে পাবার বৃথা চেষ্টা করে মরি। কেননা আমরা স্থিরকেই যথার্থ পেতে চাই। ধ্রুবকে যখন দেখতে পাইনে এবং চঞ্চলকেই যখন ধ্রুব করে তোল্‌বার জন্যে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি তখন আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কে তখন আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, যা যায় তাকে যেতে দিলেই তবে, যা থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ছন্দ দাঁড়িয়ে নেই, সে কেবলি বয়ে চলেছে; যে পদটা অত্যন্ত ভাল লাগ্‌চে তাকেও ত্যাগ করে এগতে হবে—এতে যে দুঃখ বোধ করে সেই মূঢ়। যে লোক কবিতার প্রথম পদ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কবির একই ভাবরসকে অখণ্ড জেনে কাব্য পড়ে, পড়তে তার দুঃখ নেই, এগতেই তার আনন্দ—সে যাকে ছেড়ে চলে, সমস্তের মধ্যে তাকেই আরো বেশি করে পায়—এইজন্যেই সে যাওয়াটাকে ভয় করে না, সে যাওয়ার ভিতর দিয়েই থাকাটাকে দেখে। অনন্ত ধ্রুবকেই চলার মধ্যে যে চিনে নিয়েছে চলাতেই তার সুখ। সমস্তই কেবলি যাচ্চে অথচ কোথাও লেশমাত্র ফাঁক পড়ে যাচ্চে না এরই দ্বারা আমরা পূর্ণতাকে সত্য ভাবে দেখতে পাচ্চি;—এইরূপে অন্তহীন ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই যখন অক্ষয়কে আমরা দেখতে পাই তখনই তাঁকে আমরা চিনি।

এই জন্যে মৃত্যুর বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অমৃতের পূর্ণতাকে দেখবার সুযোগ পাই। মৃত্যু ত পদে পদেই, সেই জন্য অমৃত পদে পদেই প্রকাশমান। গানের প্রত্যেক সুরটি কেবলি সরে সরে যায় সেই জন্যেই গানের অখণ্ড রাগিণী প্রকাশ পাচ্চে। একই সুর যদি স্থির হয়ে লেগে থাক্‌ত তাহলে কেবল সেই সুরটাকেই দেখ্‌তে পেতুম রাগিণীকে দেখ্‌তে পেতুমনা। সুর চল্‌তে থাকে বলেই রাগিণীর প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রাগিণীকে মনের মধ্যে যে একবার পূর্ণ করে দেখে নিয়েছে গানের প্রত্যেক খণ্ড সুরেই সে অখণ্ডের আনন্দকে লাভ করে;—কোনো সুরকেই তার আর বর্জ্জন করতে হয় না, যে সুর যাচ্চে এবং যে সুর আসচে সমস্তকেই সে পূর্ণের মধ্যে পেতে থাকে। তার কাছে সুরের চলে যাওয়া লেশমাত্র ক্ষতি নয়।

কেন না, সে তখন কানের মধ্যে নিচ্চে গতিটাকে অন্তরের মধ্যে পাচ্চে স্থিতিটিকে। নইলে, শুদ্ধমাত্র গতির দিকে তাকালে গতির তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না—সুরকেই একান্ত করে জান্‌লে রাগিণীকে জানা যায় না; সেই রকম শুদ্ধমাত্র স্থিতির দ্বারাই স্থিতিকে জানা যায় না—সুরের গতিকে একেবারে বর্জ্জন করে রাগিণীকে ধরতে পারা যায় না। এই জন্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্য আছে এইটি জান্‌তে গেলেই ভেদ থাকা চাই। এই ভেদের প্রয়োজন, ভেদকেই জানবার জন্যে নয়, অভেদকে জানবার জন্যেই। যখন ভেদকেই জানি তখন আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ; ভেদের মধ্যেই যখন অভেদকে জানি তখনি আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ। ভেদকে তখন লীলা বলেই জান্‌তে পারি এবং সেই লীলাতেই যোগ দিই, সে লীলাকে লুপ্ত করতে চাইনে। কেন না ভেদ তখন বিচ্ছেদের ব্যবধান নয়, ভেদই তখন মিলনের সেতু।

ঈশ্বরের আনন্দ সার্থক হচ্চে বন্ধনে (যেমন কবির আনন্দ সার্থক হচ্চে কাব্যে); জীবের বন্ধন সার্থক

হচ্চে আনন্দে (যেমন পাঠকের পাঠদুঃখ সার্থক হচ্চে কাব্যরসে); ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবাত্মায় প্রকাশমান হচ্চেন, জীব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হচ্চে—মিলনের এই বিচিত্র লীলা নিয়তই চলচে—যেদিক থেকে দেখ: এই লীলার মাঝখানে থেকে যাচ্চে একটা বাধা—তাকে মায়া বল, বন্ধন বল, সংসার বল যা খুসি। একে কেউবা গালি দিই, কেউবা অস্বীকার করি, কেউবা ভাল বলি—কিন্তু মাঝখানটাতে এ রয়েইছে। এই বাধাকে যদি চরম বাধা বলে মনে করি তাহলেই ভয়—কিন্তু সেটাকে যদি মাঝখানকার জিনিষ বলেই জানি তাহলে না তার প্রতি ভয়, না তার প্রতি একান্ত আসক্তি থাকে। অথচ তখন তার প্রতি প্রীতি বেড়ে ওঠে। কেননা তার ভিতর দিয়ে যখন আনন্দকে পাই তখন সেও আনন্দময় হয়ে ওঠে; ছন্দের মধ্যে দিয়ে যখন কাব্যরসকে পাই তখন সেও কাব্যরসের আনন্দের অন্তর্ভূত হয়ে প্রকাশ পায়—সেই রস যখন না পাই, তখন সমস্তটাই পরীক্ষার পড়ার মত বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে আমার বলবার কথাটি হচ্চে এই যে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদবিলুপ্তিই মুক্তি নয়, ভেদের চরিতার্থতাই মুক্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাবী ধর্ম্ম।

(২)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুল্লা হুসেন প্রথম এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে পারস্ত দেশের চারিদিকে যে ধর্ম্ম প্রচারকেরা প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তাঁহারাও ইঁহার অপ্রতিহত তেজ ও উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। দিবারাত্র কখনও ইস্পাহানে কখনও কাসানে, কখনও টেহেরানে কখনও মাহসাদে গিয়া তিনি জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তকে স্থির করিয়া এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই শীর্ণ দেহের মধ্যে যে প্রবল শক্তি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে শক্তির বিরাম ছিল না, অবসাদ ছিল না। টেহেরান হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি মাহসাদে গেলেন; সেখানে পারস্যের পূর্ব্বতন শাহের খুড়া হামজে মিরজা তাঁহাকে বন্দী করিল। এখান হইতেও পলায়ন করিয়া অল্প দল বল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমেই দলের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া মাকু সহরে গিয়া বাবকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় পশ্চিমমুখে যাত্রা করিলেন। বাবদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে চিরন্তন শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল এখন সম্মুখ সমরে তাহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার উপক্রম হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ খবর আসিল মহম্মদ সাহ মারা গিয়াছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিল।

পারস্যদেশে রাজার মৃত্যু হইলে পরমুহূর্ত্তেই অরাজকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে রাজ্য-তন্ত্রের কলকারখানা একেবারে বিকল হইয়া যায়, আদালত বন্ধ থাকে, দস্যুবৃত্তি এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার দেশব্যাপী হয় এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে।

এই দেশব্যাপী অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য মুল্লা হুসেনের ডাক পড়িল। এই সময়ে তাঁহাকে নানা দিক্ বিবেচনা করিয়া অক্লান্ত উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। একদিকে যেমন তাঁহার আশা ছিল যে তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগের যে বিরুদ্ধতা ছিল নূতন রাজার শাসনাধীনে তাহা দূর হইয়া যাইতে পারে অন্যদিকে তেমনি অনিষ্টকারীদের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্যও তাঁহাকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই—কারণ অত্যাচারীদিগকে দমন করিবার কোন ব্যবস্থা হওয়া তখন সম্ভবপর ছিল না। এই সকল বিবেচনা করিয়া মুল্লা হুসেন মাজানদারান প্রদেশসন্নিহিত বাদাস্ত সহরে শীঘ্র চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বারফুরুস সহরের মুল্লা মহম্মদ আলির অনুবর্ত্তী শিষ্যমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইলেন।

মুসলমান দেশে স্ত্রীলোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা প্রায় দেখা যায় না। কাজ্‌ভিন সহরের হাজি মুল্লামহম্মদ সালি'র কন্যা জারিন তাজ কেবল যে সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাবেরা কুররাতু-উল-অয়ন অর্থাৎ 'নয়নানন্দকর' নাম দিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ রূপসী ছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধিতেও কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না, আরবি ভাষা, কোরাণ, দর্শনশাস্ত্র এ সমস্তই তাঁহার পড়া ছিল; ইহা ছাড়া তিনি একজন বক্তা ছিলেন এবং একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে মুসলমানেরা স্ত্রীলোকদিগকে যে দুশ্ছেদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃত্তির স্ফুরণের পথে বাধা রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট, জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে ইহা বিদুষী জারিন তা-

জের অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আঘাত করিল। বাবের ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের সহিত সমানভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিবার অনুশাসন রহিয়াছে জানিতে পারিয়াই তিনি এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যখনই দেখিলেন সে ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম বটে তখনই তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যমের অন্ত ছিল না; তাঁহার পরিবারের সকলেই কেহ রাজকর্ম্মচারী কেহ ধর্ম্মযাজক ছিল—তাহাদের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপ বাক্যের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া তিনি বাবী ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে তিনি জন্মস্থান কাজভিন সহর পরিত্যাগ করিয়া বাদাস্ত সহরে বাবীদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

একবার বাবীরা অবিশ্বাসীদিগকে দলভুক্ত করিবার এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত করিবার ভার এই তেজস্বিনীর হস্তে সমর্পণ করিল। কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড এবং প্রস্তর স্তূপীকৃত করিয়া অনতিবিলম্বে একটি বক্তৃতামঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া সেই মহিলাটি বক্তৃতা দিলেন। যখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন নিমেষের মধ্যে সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া গেল। যখন তিনি ওজস্বিনীভাষায় তাহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা মহৎ কর্ত্তব্যপথ হইতে ভয়ে বিমুখ হইও না, মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম আসন্ন তাহার ভীষণতা দেখিয়া হতোদ্যম হইও না,' তখন চতুর্দ্দিক হইতে ব্যথিত হৃদয়ের আর্ত্তধ্বনি স্বরূপে 'এই জান্' (হে জীবন তুল্য) 'এই তাহিরা' (হে পুণ্যময়ী), প্রভৃতি চিৎকার বাক্য উত্থিত হইতে লাগিল। অবসন্ন চিত্তে বল আসিল, বিদ্বেষীর মন অনুকূল হইল, সংশয়ীর দ্বিধা দূর হইয়া গেল এবং অত্যন্ত বলবানও কাঁদিয়া আকুল হইল। সকলেই কঠোর ব্রত ধারণ করিল এবং আমরণ তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহার পর তাহারা যেরূপ অকুণ্ঠিত উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল তাহা হইতেই বুঝা যায় তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। কুররাতু-উল-অয়ন তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া কিছু কালের জন্য নূরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সেখানে তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিল।

উল্লিখিত ঘটনার পর আট বৎসর কাটিয়া গেছে, এখন যে ঘটনার কথা বলিব তাহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। একবার কল্পনাদৃষ্টিতে দেখ প্রকাণ্ড একটি সমতল ক্ষেত্র—তাহাতে ইতস্তত বড় বড় ঘাস ও উলুবন, মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, আঁকাবাঁকা কর্দ্দমদুর্গম রাস্তা দিয়া সমস্তটা যেন জালবোনা। উত্তর দিকে অস্পষ্ট ধূমবর্ণ কাস্পিয়ান্ হ্রদ নয়নগোচর হইতেছে। দক্ষিণে চষা জমী ক্রমে অগ্রসর হইয়া একটি জঙ্গলে গিয়া মিশিয়াছে এবং এল্‌বারুজ্ পর্ব্বত-প্রাচীর এই জঙ্গলটির গতিরোধ করিয়াছে। সেই চষা জমি এবং জঙ্গলের সঙ্গমস্থলে পুরাকালের একজন মহাত্মা সেখ্ তাবার্সির ঝোপঝাড়পরিবেষ্টিত জীর্ণ কবর, তাহার উপর একটি সমাধি মন্দির এবং চতুর্দ্দিকে একটি বাগান। এই বাগানে গুটিকতক বুনো ডালিমের গাছ, এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি ভগ্নপ্রায় স্তম্ভ, স্তূপ ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল স্তম্ভ এবং সমাধি মন্দিরের গাত্রগুলি বর্ষণজনিত ছিদ্রে পরিপূর্ণ; স্থানে স্থানে গাঢ় শোণিতের দাগ এবং চারিদিকের শ্যামল ভূমির উপর সদ্যোনির্ম্মিত আরও অনেক কবর দেখা যাইতেছে। কঙ্কালাবশিষ্টতনু, শীর্ণমুখ, কোটরগতচক্ষু, সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যপীড়নেও অক্ষুণ্ণতেজঃপুঞ্জ কতকগুলি লোককে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতেছে। বাদাস্ত-সহরে কুররাতু-উল্-অয়নের ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন উপরিউক্ত লোকগুলি সেই দলের ভগ্নাবশেষ; উল্লিখিত সমাধি-মন্দিরে তাঁহারা গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন। এই স্থানে দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া তাঁহারা অনবরত রাজসৈনিকদিগকে পরাস্ত, প্রতিহত করিয়া আসিতেছেন—আশ্চর্য্য বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা যে কেমন করিয়া শত্রুসৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিতেছেন তাহা সাধারণের ধারণারও অতীত! এখন কিন্তু শেষ সময় উপস্থিত—মানুষের ক্ষমতারও অন্ত আছে। তাঁহাদের নির্ভীক নেতা মুল্লা হুসেনের মৃত্যু হইয়াছে। একদিন ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে কোথা হইতে একটা গুলি আসিয়া লাগিল, উহাতেই তাঁহার শেষ হইল। শত্রুসৈন্যদল প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, অবশেষে বাবীরা এমন অবস্থায় পড়িল যে, গুরুর অশ্বকে হত্যা করিয়া খাইয়া তবে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল। অনাহারে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না, শত্রুকে প্রতিহত করা আর চলে না! কিন্তু তবু—এই বিপদের সময়েও তাঁহাদের নির্ভীকতা দেখিয়া শত্রুসৈন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে বাবীদিগের নিকট রাজ আজ্ঞা এই মর্ম্মে প্রেরিত হইল যে তাঁহাদের জীবন এবং স্বাধীনতার উপর কোন রূপে হস্তক্ষেপ করা হইবে না যদি তাঁহারা অবিলম্বে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বাবীরা সমাধিমন্দিরে একত্র হইলেন। অবশেষে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়া স্থির হইল। রাজপক্ষীয় নেতারা কোরাণের শপথ লইয়া সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন, ইহার উপর আর কথা

নাই! অবশেষে বাবীরা ধীরে ধীরে একে একে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং রাজ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথমে শত্রুরা তাঁহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে লাগিল। অনশনক্লিষ্ট বাবীদের সম্মুখে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সম্রাটের দুই সৈন্যাধ্যক্ষ রাজকুমার মাহদিকুলি মির্জা এবং আব্বাসকুলি খাঁ বাবী-নেতাদিগকে প্রাতর্ভোজনে আমন্ত্রণ করিল। খাইবার সময় চতুর শত্রুবর্গ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। সরলচিত্ত বাবীরা নিঃসংশয়ে আপনাদের হৃদয়ের কথা সরল, সহজ ভাবে বলিতে লাগিল। রাজকুমার খুব একাগ্রচিত্তে সমস্ত শুনিলেন। এমন সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইল দেখিয়া বড় ক্রূর হাসি হাসিলেন। হঠাৎ তিনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 'অতিথিরা ঈশ্বর নিন্দাত্মক কথা বলিতেছেন,—বুঝিতেছি উঁহারা বলিতে চান উঁহারা মহম্মদের সমকক্ষ, এমন কি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তি। নাস্তিক বিধর্ম্মীর নিকট সত্যে বদ্ধ হইলেও সে সত্য পালনীয় নহে এবং সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।' সৈনিকগণ আসিয়া অসহায়, নিরস্ত্র বাবী-নেতাদিগকে বন্দী করিল, অন্য একদল সৈন্য বাবীদের বাসায় গিয়া সম্মুখে উপস্থিত অন্নে হাত দিবার পূর্ব্বেই অভুক্ত অবস্থায় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বন্দীদিগকে রাজসৈন্যাধ্যক্ষগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মাটিতে ফেলিয়া তাঁহাদের গাত্রচর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বধ করা হইল। কেবল পাঁচ ছয় জন বাবী-নেতাকে বিজয়ী রাজপুত্রের সহিত বারফুরুস সহরে লইয়া যাইবার জন্য জীবিত রাখা হইল। সৈনিকগণ এই বন্দী লইয়া এবং হতদিগের মস্তক বর্ষাফলকে বিদ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সহরে প্রবেশ করিল। পথে ধর্ম্মযাজক মুল্লারা তাহাদিগকে ধন্য ধন্য করিল এবং হতাবশিষ্ট কয়জনের রক্ত দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজসৈন্যাধ্যক্ষদিগের ইচ্ছা ছিল বাবীদিগকে টেহেরান সহর পর্য্যন্ত লইয়া যায় এবং যুবক সম্রাটের সম্মুখে দুঃসাহস শত্রুদিগকে একবার উপস্থিত করে। মুল্লারা কোনমতেই ছাড়িল না; অবশেষে তাহাদের কথাই রহিল এবং হাজিমুল্লা মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য অবশিষ্ট বাবীদিগকে বারফুরুস সহরের হাটে লইয়া গিয়া প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইল। বীরের ন্যায় অকাতর চিত্তে তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিলেন, অবশেষে রক্তমাখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলির উপর রাত্রির অন্ধকার আসিয়া অবতীর্ণ হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপনিষৎ। *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদ উপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। কিছুদিন হইল, অধ্যাপক পৌল্ ডয়সন 'The Philosophy of the Upanishads' অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্ব নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ ব্যাপক আলোচনার অভাব এদেশে ছিল। হীরেন্দ্র বাবু তাহা দূর করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদের উপরে ব্রাহ্মসাহিত্য ছাড়া দু-একখানি পুস্তক দেখিয়াছি, কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কেননা সেগুলি মূলতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা নয়। সেরূপ আলোচনা করিতে গেলে তত্ত্বের আসল সমস্যাগুলি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার সমাধানই বা কিরূপে হইয়াছে তাহার পরিচয় থাকা চাই। নহিলে কেবল কথার জঞ্জালই সৃষ্টি করা হয়, কিছুই জানা যায় না।

হীরেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে আমাদের অভাব মোচন হইয়াছে। তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ বিষয় সকলের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের এক একটি দিক্—সগুণবাদ, নির্গুণবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি এমন করিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে উপনিষদগুলি নিজেই নিজের কথা বলে, লেখকের ব্যাখ্যার বাহুল্য ঘুচিয়া যায়। বস্তুত উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার ভাষা যে এমন আশ্চর্য্য বিশদ হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

অথচ আমাদের দেশের চিন্তাভীরু লেখকদিগের ন্যায় সকল মতামতের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখ তাকাইবার কোন লক্ষণও তাঁহার গ্রন্থে দেখা গেল না। তাঁহার আলোচনায় পদে পদে তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধান ও বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে প্রাচীন ভারতে জীবনকে যেমন চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিল চারি আশ্রমের উপযোগী বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যের সময়ে শ্রুতিধারণ করিতে হইত, গার্হস্থ্যে ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত, অরণ্যে গমন করিলে আরণ্যকগ্রন্থ প্রধান উপজীব্য ছিল এবং শেষ অবস্থায় ছিল উপনিষদ্। এই মত সত্য অথবা ইউরোপীয়দের মত সত্য আমরা তাহার বিচারে অধিকারী

* উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে লোটাস্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নহি। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে একই সময়ে মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছিল এ কথা বলিলে অভিব্যক্তির নিয়মকে অস্বীকার করা হয়। উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব যে বিদ্যমান তাহা লেখক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। একদিকে মন্ত্র ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড, অন্যদিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, এই দুই ধারাকে এক ধারা বলিলে চলে না। এই দুই ধারা যে একই কালে উৎপন্ন, ইহাদের মধ্যে পারম্পর্য্য কিছুই নাই তাহা মন স্বীকার করিতে চায় না। অবশ্য, এ কথা সম্ভবপর হইতেও পারে যে, ইহাদের উৎপত্তি-কালের পূর্ব্বাপরতা এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতর অনৈক্য থাকিলেও কোনো বিশেষ একসময়ে আমাদের সমাজে সকল গুলিই সমান শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য বেদের এই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হওয়াতে ইহাদের ভিতরকার বিরোধের একপ্রকার সমাধান হইয়া গিয়াছে। বস্তুত যাগযজ্ঞ ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের চিত্ত সে দিকে স্বাধীন ছিল এবং বাহ্য অনুষ্ঠানের জটিল জালের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া সহজেই তাঁহাদের চিন্তা ব্রহ্মবিদ্যার মুক্ত আকাশে সঞ্চরণ করিতে পথ পাইয়াছিল এই কথা অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, যে দুইজন মহাপুরুষ লোকপ্রচলিত পন্থাকে অস্বীকার করিয়া উদার ধর্ম্ম-পথের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শাক্যসিংহ উভয়েই ক্ষত্রিয়।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন যে উপনিষদে পরিস্ফুট আকারে আমরা যে সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করি তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অনেক লোকের গবেষণার ফল। ডয়সন্ সেই জন্য উপনিষদের ভিতর হইতে নানা কালের চিন্তার স্তরপর্য্যায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন উপনিষদের প্রথম স্তর—নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। নেতি নেতি শব্দবাচ্য এক বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় নিরাকার সত্তা আছেন এবং আর কিছু নাই এই তত্ত্ব প্রথমে বৈদিক বহুদেববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছিল। তারপর যখন জগতে ও ব্রহ্মে যোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন জগৎ এবং ব্রহ্ম একই এই মত প্রচারিত হইল। ইংরাজীতে ইহাকে বলে প্যান্‌থীজম্। ইহাই উপনিষদের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ স্থির করা হইল। অর্থাৎ জগতে যদিচ ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে তথাপি জগৎকে তিনি বহুগুণে ছাড়াইয়া আছেন। ইংরাজীতে এ মতের নাম থিইজম্। শেষে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব একদিকে, সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যদিকে স্বতন্ত্র হইয়া দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করিল তখনই উপনিষদ যুগের পরিণাম এবং সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতির আরম্ভ।

অধ্যাপক ডয়সন্ অনেক প্রমাণের দ্বারা এই ক্রম-বিকাশের স্তরপর্য্যায় উপনিষদের ভিতর হইতে বাহির করিবার বিধিমতে চেষ্টা পাইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষার বিভেদের প্রমাণের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় নাই। বিশুদ্ধ অনুমানের উপরই তাঁহার প্রমাণ-চেষ্টার প্রধান নির্ভর। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যে কোন উপনিষদ্ টানিয়া লওয়া যাক্ না কেন তাহার মধ্যে ডয়সন্‌কথিত সকল মতবাদই এক সঙ্গে গায়ে গায়ে মিলিয়া আছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার মধ্যে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই আছে—ব্রহ্মে জগতে ভিন্ন কখনো বলা হইতেছে কখনো বা উভয়ে অভিন্ন বলা হইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে উপনিষদ্ তত্ত্বগ্রন্থ নয়, তাহা ঋষিকবিদের উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র। তর্কযুক্তির সাহায্যে সত্যকে প্রমাণ করিবার ব্যস্ততা ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না, ইহা শারীরক মীমাংসাও নয়, শ্রীভাষ্যও নয়—একেবারে বিশুদ্ধ উপলব্ধির কথা, সহজ প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা। সুতরাং তাহার মধ্যে সকল মতবৈচিত্র্যেরই অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। জীবনের মধ্যে যেমন বিচিত্র বিরুদ্ধ জিনিসের মিল ঘটে তেমনি নানা বিরুদ্ধ মতামত এই উপনিষদের মধ্যে মিলিয়াছে। উপনিষদ যদি দর্শনশাস্ত্র হইত তবে তাহাকে তর্কের চুলচেরা পথে চলিতে হইত এবং তাহা হইলেই যাহা অখণ্ড উপলব্ধির জিনিস তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া পরস্পর যুঝিয়া মরিত।

হীরেন্দ্র বাবু যদিচ ডয়সনের মতের সমালোচনা কোথাও করেন নাই তথাপি তাঁহার গ্রন্থে আমরা এই ভাবেরই সাক্ষ্য পাইয়াছি। তাঁহার আলোচনাকে এক প্রকার ডয়সনের আলোচনার প্রতিবাদ বলিলেও চলে। কারণ তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে সগুণনির্গুণ, এই দুই কোটির মিলই উপনিষদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ্ যে দর্শনশাস্ত্র বা ভাষ্যমাত্র নয়, তাহা যে আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর হইতে উপলব্ধ অখণ্ড সত্যের সাক্ষাৎকারের কথা, তাহাও তিনি একাধিক স্থানে অসঙ্কোচেই বলিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা আমাদের জানাইতে হইতেছে। লেখক উপনিষদের মতের সহিত থিয়সফির মতকে মিলিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর প্রভৃতি সম্বন্ধে থিয়সফিকথিত সংস্কারগুলিকে উপনিষদের ঘাড়ে

চাপাইয়া দিয়াছেন। হইতে পারে যে ও সকল গুহ্যতত্ত্ও উপনিষদের ভিতরে কোন না কোন আকারে নিহিত ছিল; কারণ, থিয়সফি তো মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার বহির্ভূত জিনিস নয়; থিয়সফির মূল কত কালের কত গুহ্য সাধনার মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তবে ইহাতে অনিষ্ট হয় এই যে, গোড়াতেই যে পাঠকেরা আধুনিক সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের প্রতি আস্থাবান্ নয় তাহারা একদিকে তাঁহার যুক্তি ও অপরদিকে তাঁহার সংস্কারের ঘাতপ্রতিঘাতে পীড়া বোধ করিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আধুনিক জীববিজ্ঞানে বলে যে যদিও কোষাণুর (cell) সমষ্টি মিলিয়া স্থূল শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তথাপি প্রত্যেক কোষাণু এবং তাহার সূক্ষ্মতম ভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। লেখক এই কথাটাকে লইয়া উপনিষদের "বিরাট" ও "হিরণ্যগর্ভ" এ দুয়ের প্রভেদ বুঝাইলেন এইরূপ:—কোষাণুর সমষ্টিসমন্বিত স্থূল শরীরের মত ব্যষ্টি স্থূল দেহের যে সমষ্টিমূর্ত্তি তাহারই নাম "বিরাট" এবং প্রত্যেক কোষাণুর সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ন্যায় সূক্ষ্মব্যষ্টি যে সমষ্টি শরীর ধারণ করেন তাহারই নাম "হিরণ্যগর্ভ"। এই সূক্ষ্মব্যষ্টির শরীরই মহাত্মাগণ কালে কালে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের উপলব্ধি সূক্ষ্মতর হইয়া থাকে। এ সকল মতবাদের স্বতন্ত্র স্থান থাকিতে পারে কিন্তু উপনিষদের মতব্যাখ্যার সহিত ইহাদিগকে জড়িত করা আমরা সঙ্গত মনে করি না।

এটুকু দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও পুস্তকখানি যে অতীব উপাদেয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখকের যাহা প্রধান বক্তব্য বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্বের যে দুইটি দিক্ উপনিষদ্ স্বীকার করিয়াছেন—একটি জীবাত্মার দিক্ বা সীমার দিক্ এবং অপরটি পরমাত্মার স্বরূপের দিক্ বা অসীমের দিক্—এবং এ দুয়ের যে অভিন্ন যোগের কথা উপনিষদ্ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম যেখানে আপনাতে আপনি, সেখানে তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় সকল গুণাতীত; কিন্তু যেখানে তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন সেখানে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস, চিদ্ঘন ও আনন্দময়। অর্থাৎ সত্তা এবং প্রকাশ, ভাব এবং রূপের যে দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে আছে তাহা তাঁহার মধ্যে নাই। আমাদের বুদ্ধি সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন দেখিয়া আমরা নিত্যকে এবং অনিত্যকে সীমাকে এবং অসীমকে একই সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না, সেই জন্য আমাদের বুদ্ধি কল্পনা করে যে এ দুই বুঝি বাস্তবিক বিচ্ছিন্ন। এ দ্বৈত কেবল আমাদের বুদ্ধির কাছে। অথচ আমরা ইহাও বুঝি যে আমাদের বুদ্ধি যদি সীমা-পরিচ্ছিন্ন না হইত তবে এ দ্বৈত তাহার মধ্যেও থাকিত না। সেই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মের মধ্যে এ দ্বৈতের অবসান আছে এ কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনিই সজোরে বলিয়াছেন যে বুদ্ধির দ্বারা তিনি গম্য নহেন। তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তাঁহাকে একরকম করিয়া উপলব্ধি করা যায়। তিনি অন্তরে "অন্তর্য্যামী" বাহিরে "মহেশ্বর", বিশ্বাভিব্যক্তিতে "বিধাতা" অথচ "বিশ্বাতিগ"—সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব কোনদিনই বিশুদ্ধ প্যান্থিইজ্‌মও নয় বিশুদ্ধ আইডিয়ালইজ্‌ম্‌ও নয়।

পরিশেষে একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এ আলোচনা বন্ধ করিব। সেটি "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি"র তত্ত্ব। উপনিষদের মধ্যে লেখক এই তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করিয়া আবিষ্কার এবং ইহাকে বিশদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এ জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

প্রধান বলিতে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে পুরুষকে বুঝায়। সাংখ্যের দ্বৈতবাদের উৎপত্তি যে ঐ তত্ত্বে তাহা দেখাই যাইতেছে।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই প্রকৃতি এবং পুরুষ—একটি ক্ষয়শীল এবং অপরটি অক্ষয়—এ উভয়ই একই সঙ্গে বিদ্যমান—উপনিষদের এই সৃষ্টিতত্ত্বটি খুবই আশ্চর্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এ কথার আভাস আছে। সমস্ত বিচিত্র বিশ্বশক্তির আমরা একটি ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তনশীল রূপ দেখিতেছি কিন্তু তাহার অন্তরতর রূপটি অক্ষয় অবিনাশী। এই কারণেই শক্তির রূপান্তর ঘটিতেছে কিন্তু বিনাশ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ তাহার মধ্যে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই তত্ত্বই একত্র বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতিপুরুষের একত্র অবস্থানের এই মূলতত্ত্বটি উপনিষদে কি সাহসের সঙ্গে চিন্তিত এবং ঘোষিত হইয়াছে!

অথচ যিনি প্রধানও নন্ ক্ষেত্রজ্ঞও নন্—দুয়েরই সমন্বয় যাঁহাতে, উপনিষদে তিনিই প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতি এবং তাহার সাক্ষী জ্ঞাতা পুরুষ এ দুইই সেই একের মধ্যে সমাহিত। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধের দিনে এই একের বার্ত্তার জন্য কি প্রাচীন উপনিষদের দিকে দ্বৈতবাদী জগৎকে তাকাইতে হইবে না?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নানাকথা।

ওলাউঠার প্রতিষেধক।

ইংলণ্ডের একজন চিকিৎসক ডাক্তার মল্‌সন্ ওলাউঠা নিবারণের এক অভিনব উপায় সম্প্রতি এক পত্রিকায়

প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই :—একটা ডবল পয়সার মত আয়তন ও ১/১৬ ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট একটী অমিশ্রিত তাম্রখণ্ড ছিদ্র করিয়া গলায় ঝুলাইতে হয়। নাভীর প্রায় দুই ইঞ্চি উপরে পেটের সংস্পর্শে ইহা আসা চাই। ত্বক্ ও পরিচ্ছদের সঙ্গে তাম্রখণ্ডের পুনঃপুনঃ ঘর্ষণে ত্বকের ভিতর দিয়া যথেষ্ট তাম্র শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহাই পরিধানকারীকে ওলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যখন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় তখন ইহা সর্ব্বদা পরিধান করা যাইতে পারে। এই তাম্রখণ্ড রক্ষাকবচ বা দৈব শক্তিসম্পন্ন কিছু নহে, ইহা যে বিজ্ঞানসম্মত একটী রোগ নিবারক, তাম্রখনির শ্রমজীবিদের মধ্যে যে এই রোগের প্রকোপ নাই ইহা তাহারই প্রমাণ। হানিম্যান তাঁহার এক গ্রন্থে ("Lesser writings") বলিয়াছেন যে পরিমিত আহার করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাম্র-ধাতুর ব্যবহার ওলাউঠার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।" হাঙ্গেরিতে যাহারা ত্বকের সংস্পর্শে তাম্রখণ্ড ব্যবহার করে তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন সেণ্ট্-পিটার্সবর্গে ওলাউঠার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় তখন ডাক্তার মল্‌সন্ সেই নগরে গিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাম্রখণ্ড ধারণ করিতেন এবং সেই জন্যেই সম্ভবতঃ রোগাক্রান্ত হন নাই। এই সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া গণ্য না করিতে পারেন কিন্তু তাম্রসংক্রান্ত ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবিরা যে এই মহামারী হইতে নিরাপদ থাকে ইহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

উচ্চ হইতে পতন।

অনেক উচ্চ হইতে পড়িয়াও যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে তাহাদের অপেক্ষা দর্শকগণ অধিকতর ক্লেশ পান। ফরাসি লেখক ম্যানুজিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বহু উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও মৃত্যু ঘটে নাই এমন একটি অদ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। এই লোকটী সম্রাট্ নেপোলিয়নের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্যারিসের গির্জ্জার অত্যুচ্চ গম্বুজের উপর সাজাইবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একটা মই সরাইবার সময় সে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া একেবারে মঞ্চ হইতে চিৎকার করিয়া তাহার সহযোগি বন্ধুদিগকে Tiens, me voila parti বলিতে বলিতে লম্ফ প্রদান করিল। গির্জ্জার ছোট একটা গম্বুজের উপর পড়িয়া সেখান হইতে গির্জ্জার তোষাখানার ছাদের উপর আসিয়া পড়িল এবং টালি ভাঙ্গিয়া একেবারে ঘরের চালের রুয়ার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্য এই, তথনও সে সংজ্ঞা হারায় নাই; প্রশ্ন করিলে সে তার নাম ধাম বলিল। কিছুকাল পরে বিছানায় শায়িত হইলে সে অচেতন হইয়া পড়িল; কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে সে চেতনা লাভ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। বাল্যকালে একবার ম্যানজিনি নিজে বহু উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন, দ্রুতবেগে পড়ার দরুণ সমস্তই যেন তাহার কাছে অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইতেছিল এবং নিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে তাঁহাকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

নয় বৎসর পূর্ব্বে একজন জর্ম্মাণ ভূতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার আলপাইন পর্ব্বত হইতে পড়িবার সময় তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িবার সময় তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অতীত জীবনের সৌন্দর্য্যময় একটি চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তখন তিনি জীবনমরণের কথা স্থির হইয়া চিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন। ভূমিসাৎ হইয়াও তিনি কোনো বেদনানুভব করেন নাই, কেবলমাত্র পাথরের গায়ে তাঁহার মাথার সংঘাতজনিত একটি শব্দ মাত্র তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

আর একজন আল্‌পাইন পরিব্রাজক পড়িবার সময় তাহার পরিবার ও জীবনবীমার কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্বাস রোধ হয় নাই; কেবলমাত্র তুষারাবৃত ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তিনি হঠাৎ অচেতন হইয়াছিলেন। কোনো কোনো আল্‌পাইন আরোহীগণ বলেন পড়িবার সময় তাঁহাদের চিত্ত কোনো প্রকার চিন্তাকুল হয় না।

সম্প্রতি একজন ইংরেজ ডোভারে ৪০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে পাঁচ ফুট জলে সংজ্ঞাহীনাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পায়ে জুতা ছিলনা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে লোকটি জলে পৌঁছিয়া জুতা খুলিবার চেতনাটুকু হারায় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী,
পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ... ৫৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প

প্রথম ভাগ।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮২০ সংখ্যা   ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

অনন্ত পথে।

রথের চূড়ার ধ্বজা এখনো দেখিনি রাজপথে,
বিপুল জনতা মাঝে দাঁড়ায়ে রয়েছি কোনমতে
আশায় বাঁধিয়া বুক। সুদূরের স্তব্ধ সভামাঝে
রহি রহি শুনি শুধু গম্ভীর বিজয়ভেরী বাজে।
প্রভাতে অরুণ-স্পর্শে, দিবসের দীপ্ত তপনের
ভীষণ মহিমাতলে, সন্ধ্যারাগে মুগ্ধ স্বপনের
বরণ লীলার মাঝে, রজনীর প্রেম আলিঙ্গনে,
বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে, ঋতুর মধুর আবর্ত্তনে,
অনন্ত জীবনপথে চলিয়াছি চির-অভিসারে
একান্ত নির্ভরভরে; মেলিয়াছি আঁখি বারেবারে
তারি সাথে মিলনের আশে, ভাবি ঐ এল হায়!
কোথা রথ, কোথা পথ, বাঁশীটুকু শুধু কেঁদে যায়!
বিজয়ীর একি খেলা! তবু জানি পাইব সন্ধান
তাই সুখ, তাই তৃপ্তি, সে আনন্দে হিয়া কম্পমান।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

গীতাপাঠ।*

(আবহমান)

শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গীতাপাঠ উপলক্ষে ত্রিগুণতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা-বাহুল্যের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গীতাশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত জুড়িয়া গুণ শব্দ নানা কথাপ্রসঙ্গে, নানা স্থলে, নানা ছলে, পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা কোনো গীতাপাঠকের চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। এইজন্য ত্রিগুণ যে পদার্থটা কি, আর, তাহার ভিতরে আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাগুলি কেমন আশ্চর্য্যরূপে আগলাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়া দেখানো গীতাশ্রাবয়িতার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আমি এই দুরূহ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার স্বপক্ষসমর্থন এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; অতএব শেষোক্ত বাজে কাজে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক।

ত্রিগুণের ভিতরের কথার অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সত্তা কাহারো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সত্তা তোমারও আছে, আমারও আছে, পশু-পক্ষীরও আছে, ধাতু-প্রস্তরেরও আছে। সত্তা যখন সকলেরই আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই আছে। কেন না, সত্তার প্রকাশ না হইলে, সত্তার কোনো নিদর্শন থাকে না; সত্তার কোনো নিদর্শন না থাকিলে—"সত্তা আছে" এ কথা একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। অতএব যখন তুমিও বলিতেছ, আমিও বলিতেছি এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, সত্তা সকলেরই আছে, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে; অথবা, যাহা একই কথা—সকলেরই সত্তার সঙ্গে চেতনা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সকলেরই সত্তা আত্মসত্তা। তোমার সত্তাও তোমার আত্মসত্তা, আমার সত্তাও আমার আত্মসত্তা, গোমহিষের সত্তাও গোমহিষের

* শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধপাঠ সভায় পঠিত।